আচার্য্যের উপদেশ।

প্রথম খণ্ড।

মাসিক ব্রাহ্মসমাজে

আচার্য্য শ্রীযুক্ত দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর

কর্ত্তৃক পঠিত।

কলিকাতা

আদি ব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যের দ্বারা মুদ্রিত ও

প্রকাশিত।

৫৫নং অপার চিৎপুর রোড।

১৪ জ্যৈষ্ঠ ১৩০৬ সাল।

ওঁতৎসৎ

আচার্য্যের উপদেশ।

৫৫ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬ জ্যৈষ্ঠ।

মনুষ্য অতি এক সূক্ষ্ম অদৃশ্য মায়া-বন্ধন লইযা জন্ম গ্রহণ করে। সে বন্ধন লূতা-তন্তু অপেক্ষাও সূক্ষ্ম কিন্তু পর্ব্বত অপেক্ষাও গুরুতর। শিশু ভূমিষ্ঠ হইলে ধাত্রী নাড়ীচ্ছেদ করে কিন্তু সে নাড়ী একটা নির্ম্মোক মাত্র। আসল যে নাড়ী তাহা তাহার ভিতরে। ছিন্ন নাড়ী ছিন্ন মৃণাল-খণ্ড-সদৃশ, কিন্তু অচ্ছেদ্য নাড়ী সেই মৃণালের সূত্রসদৃশ। সে সূত্র জীবনের সঙ্গী। সে সূত্রের আকর্ষণ অতীব সুগভীর। সে আকর্ষণ অনেক জলের তলে চাপা থাকিতে পারে কিন্তু তাহা যায় না।

সূর্য্য হইতে পৃথিবী প্রসূত হইয়াছে ইহা শুধু আজিকার কালের বৈজ্ঞানিক সিদ্ধান্ত নহে, সূর্য্যের অস্তাচলসংশ্রিত ভূখণ্ডে এখনো এ কথা অতি অল্প লোকেই জানে যে সূর্য্যের উদয়-প্রমুখ আমাদের এই ভারতবর্ষে ও-সিদ্ধান্ত একটুকুও নূতন নহে। আমাদের ঋষিরা সূর্য্যকে সবিতা বলিয়া জানিতেন। 'সবিতা' কিনা পৃথিব্যাদির প্রসবিতা। পৃথিবী ও সূর্য্যের মধ্যে যে আকর্ষণ তাহাও এক অদৃশ্য নাড়ীর আকর্ষণ।

পৃথিবীর প্রসব-দিনে তাহার স্থূল নাড়ীই ছিন্ন হইয়াছিল কিন্তু তাহার সূক্ষ্ম নাড়ী একবারেই অবিচ্ছেদ্য। আজিও সেই সূক্ষ্ম নাড়ীর এক প্রান্ত পৃথিবীর নাভিকেন্দ্রে আর এক প্রান্ত সূর্য্যের হৃদয়াভ্যন্তরে প্রোথিত রহিয়াছে। সেই নাড়ীর মধ্য দিয়া মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে পৃথিবীর সংবাদ সূর্য্যের নিকট সূর্য্যের সংবাদ পৃথিবীর নিকট যাতায়াত করিতেছে। পৃথিবী প্রাণ চাহিতেছে সূর্য্য সেই বৈদ্যুতিক পথের মধ্যদিয়া রাশি রাশি প্রাণ প্রেরণ করিতেছে। পৃথিবী জ্যোতি চাহিতেছে সূর্য্য মুক্তহস্তে জ্যোতি বিতরণ করিতেছে। পৃথিবী সূর্য্যকে এক মুহূর্ত্তও ছাড়িয়া থাকিতে পারে না। পৃথিবী নাকি আমাদের তাই আমরা অগ্রে পৃথিবীর কথা উল্লেখ করিতেছি, কিন্তু একা পৃথিবী কেবল নয়, পৃথিবী এবং তাহার আট সহোদর সকলেই এক সূর্য্যের অঞ্চল ধরিয়া ধরিয়া আকাশ-মণ্ডলে ফিরিতেছে। সূর্য্য অপ্রতিহত স্নেহ সহকারে সকলকেই জ্যোতি প্রাণ দীপ্তি কান্তি প্রত্যহ নিয়মিত রূপে বণ্টন করিয়া দিতেছে।

সূর্য্য হইতে যেমন পৃথিবী প্রসূত হইয়াছে সেইরূপ সনাতন আদি সূর্য্য হইতে জ্ঞান-সূর্য্য প্রেম-সূর্য্য হইতে আমাদের আত্মা প্রসূত হইয়াছে। সমস্ত সৌর জগতের মধ্যে পৃথিবী নাকি আমাদের নিকটতম

বাসস্থান তাই উপরে পৃথিবীর কথা উল্লেখ করিয়াছি। তেমনি সমস্ত ভালবাসার বস্তুর মধ্যে আত্মা নাকি আমাদের নিকটতম বস্তু, তাই অগ্রে আমরা আত্মার কথা উল্লেখ করিতেছি। সমস্ত জগৎই পরমাত্মা হইতে প্রসূত, কিন্তু আমাদের আত্মা আমাদের নিকট সমস্ত জগৎ অপেক্ষা আদরের বস্তু, তাই তাহারই প্রতি আমরা বিশেষ রূপে লক্ষ্য করিতেছি। আত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে কি যে আশ্চর্য্য অদৃশ্য সম্বন্ধ-সূত্র বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা অনির্ব্বচনীয়। পৃথিবীতে এত দার্শনিক জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন কিন্তু কেহই সেই সম্বন্ধ-সূত্রের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত বুদ্ধিতে আনিতে পারেন না। অসীমের সহিত সসীমের সম্বন্ধ যে কিরূপে সম্ভবে ইহা কোন দর্শনে বলিতে পারে না, অথচ "সম্বন্ধ আছে" ইহা কোন দর্শনেই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু আমাদের পবিত্র ঋষিরা সে সম্বন্ধ ধ্যানে প্রত্যক্ষ করিয়া বলিয়াছেন 'ধিয়োয়োনঃ প্রচোদয়াৎ' যিনি আমাদিগকে বুদ্ধি-বৃত্তি প্রেরণ করিতেছেন। তাঁহার সহিত আমাদের কি নিকট সম্বন্ধ একবার ভাবিয়া দেখ, বুদ্ধি-বৃত্তি কি সামগ্রী তাহা ভাবিয়া দেখ, ও কিরূপে তিনি তাহা আমাদিগকে প্রদান করিতেছেন, তাহা ভাবিয়া দেখ। কোন বন্ধু যদি বাহক-দ্বারা কোন একটি দান-সামগ্রী প্রেরণ

করেন, তবে সে সামগ্রীতে আমরা তাঁহার হৃদয়ের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত দেখি। যদি তিনি আপন হস্তে সেই দান-সামগ্রী প্রদান করেন, তবে তাঁহার হৃদয়ের প্রতি-মূর্ত্তি নহে কিন্তু তাঁহার হৃদয়ের নিজ মূর্ত্তি আমরা আমাদের চক্ষের সমক্ষে জাজ্বল্যমান দেখিতে পাই। কিন্তু মাতা যখন শিশুকে দুগ্ধ দান করেন তখন মাতা আপন হৃদয়ের প্রতিমূর্ত্তিও নহে স্বমূর্ত্তিও নহে কিন্তু সাক্ষাৎ হৃদয় যাহার মূর্ত্তি নাই যাহা অমূর্ত্ত সেই মর্ম্মগত হৃদয় প্রদান করেন। এজন্য শিশু তাহা চক্ষে দেখিতে পায় না কিন্তু মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করে, তাহাতে শিশুর প্রতি রোম-কূপে প্রাণের সঞ্চার হয়। পরমাত্মা আমাদের আত্মাতে যে, বুদ্ধিবৃত্তি প্রদান করিতেছেন, তাহা তিনি দূরস্থ বন্ধুর ন্যায় বাহক দ্বারা প্রেরণ করিতেছেন না, অভ্যাগত বন্ধুর ন্যায় হস্ত দ্বারাও প্রেরণ করিতেছেন না, মাতার ন্যায় হৃদয়ের বহিরুচ্ছ্বাস দ্বারাও প্রেরণ করিতেছেন না, কিন্তু তিনি স্বয়ং আপনি আমাদের আত্মাতে অন্তর্যামী হইয়া বুদ্ধিবৃত্তি প্রেরণ করিতেছেন। আমাদের আত্মার নিভৃত স্থানে যেখানে তিনি বাস করিতেছেন সেই খানে তাঁহাকে দর্শন করিয়া পুরাতন ঋষিরা বলি-য়াছেন "হিরন্ময়ে পরে কোষে বিরজং ব্রহ্ম নিষ্কলং তচ্ছুভ্রং জ্যোতিষাং জ্যোতিস্তৎযদাত্মবিদোবিদুঃ"

যিনি তাঁহাকে আপন আত্মার সেই নিভৃত স্থানে অন্বেষণ করেন তাঁহার যত্ন কখন বিফল হয় না। সে নিভৃত স্থান কোথায় ? সে মর্ম্ম-স্থান কোথায় ?

মনুষ্য মাত্রেরই একটি অতি গভীর মর্ম্মস্থান আছে সেটি কি ? বিষয়ী লোককে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিবেন সেটি স্বার্থ। শিশুকে জিজ্ঞাসা করিলে সে বলিবে মাতা। যুবাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিবেন প্রেয়সী। যোদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি বলিবেন যশ। কাহার যে কি মর্ম্মস্থান তাহা সে-ই জানে, অনেক সময়ে সে-ও তাহা জানে না। শিশু যখন মাতৃক্রোড়ে থাকে তখন শিশু জানে না যে, মাতাই তাহার প্রাণ। মাতার আসিতে যদি দণ্ড-দুই বিলম্ব হয়, তখন সে তাহা অনুভব করে, এবং তাহার ক্রন্দন শুনিয়া অপর লোকেরাও তাহা অনুভব করে। মর্ম্মে আঘাত লাগিলেই মর্ম্মস্থান ধরা পড়ে। মনুষ্যের মর্ম্মস্থানকেই বলা যাইতে পারে মনুষ্যের সজীব প্রদেশ, এবং যাহার যে-প্রদেশ তাহা হইতে যত দূরে, তাহা ততই নির্জীব বা মৃত-শব্দের বাচ্য।

যে ভক্ত এরূপ যে, তাঁহার উপাস্য দেবতা তাঁহার মর্ম্মস্থান তিনিই প্রকৃত ভক্ত, তিনিই প্রকৃত ঈশ্বর-প্রেমী। আর এক দিকে দেখা যায় যে, ঈশ্বর কাহার না মর্ম্ম-স্থান ? কোন্ শিশুর মর্ম্মস্থান তাহার মাতা

নহে? যে শিশু মাতার ক্রোড় কি তাহা জানে না তাহার কথা স্বতন্ত্র কিন্তু যে শিশু মাতৃস্তনের একবার আস্বাদ পাইয়াছে, মাতাতেই তাহার প্রাণ গঠিত হইয়াছে, মাতার প্রাণই তাহার প্রাণ এবং তাহার প্রাণই মাতার প্রাণ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। কোন্ আত্মা পরমাত্মার ক্রোড়ে অবস্থিতি করিতেছে না, কোন্ আত্মা তাঁহার প্রেমামৃত পান করিতেছে না, পরমাত্মা হইতে দূরে পড়িলে কোন্ আত্মা স্বচ্ছন্দে থাকে, আরামে থাকে, কুশলে থাকে, আনন্দে থাকে? ঈশ্বর-প্রেমী এবং ঈশ্বর-বিচ্যুত দুই ব্যক্তির মুখ দেখিলেই ধরা পড়ে। কোন্ শিশুর মাতা বর্ত্তমান আছে এবং কোন্ শিশুর মাতৃবিয়োগ হইয়াছে তাহা মুখ দেখিলেই জানা যায়। যে শিশুর মাতৃবিয়োগ হইয়াছে সে যে আদবেই হাসে না বা খেলে না তাহা নহে। তাহার যে কি গুরুতর বিপদ হইয়াছে তাহার কিছুই হয় ত সে জানে না। সে তাহা জানে না কিন্তু তাহার মর্ম্ম তাহা জানে, তাহার হাসির মধ্য হইতেও তাহার খেলার মধ্য হইতেও তাহার মর্ম্মের ক্রন্দন কোন না কোন আকারে বাহির হইতে থাকে। ঈশ্বর-বিচ্যুত ব্যক্তিরও সেইরূপ দশা। তিনি যে হাসেন না তাহা নহে, খেলেন না তাহা নহে। তিনি হাসেন কিন্তু তাহার মর্ম্ম হাসে না। তিনি চলেন বলেন কিন্তু

তাঁহার মর্ম্ম মুখ ভার করিয়া বসিয়া থাকে, ক্রন্দন করে, পৃথিবীকে শ্মশান দেখে। মাতৃ-বিযুক্ত শিশু যখন মাতার জন্য ক্রন্দন করে, তখন তাহার ধাত্রী তাহাকে সান্ত্বনা করিতে পরাভব মানে, হা! তাহার সে ক্রন্দন নিষ্ফল! কিন্তু ঈশ্বর-বিযুক্ত আত্মার অন্তর্বাষ্প ঘনীভূত হইয়া যখন তাঁহাকে বিষাদে আচ্ছন্ন করে, তখন তাহার অশ্রুবারি মরুভূমিতে পতিত হয় না, কেন না যাঁহার জন্য তাহার প্রাণ ভিতরে ভিতরে ক্রন্দন করিতেছে তিনি তাহার নিকট হইতেও নিকটতম। তবে কেন আত্মা তাহার অন্তরাত্মাকে না ডাকিবে? মোহ-যবনিকা কেন না অপসারিত করিয়া প্রাণের প্রাণকে অবলম্বন করিবে? মাতা এবং শিশুর মধ্যে, প্রিয়তম এবং প্রিয়তমের মধ্যে, প্রাণ এবং প্রাণের মধ্যে কেন একটা প্রাচীর থাকিবে? প্রেমের কি এত বল নাই যে, প্রাচীর উল্লঙ্ঘন করিতে পারে! মোহের বাঁধ ভাঙ্গিয়া ফেলিতে পারে! অতএব ঈশ্বর হইতে বিযুক্ত হইয়াছ বলিয়া ঈশ্বরকে ভুলিয়া থাকিতে চেষ্টা করিও না। মর্ম্মের ক্রন্দন দ্বারা মোহ-যবনিকা উদ্ঘাটন কর তাঁহাকে দেখিতে পাইবে, প্রাণের প্রাণকে পাইয়া জীবন পাইবে, দুঃখ শোক জরা মৃত্যু অতিক্রম করিবে, তাহা হইলে মঙ্গল পৃথিবীতে, মঙ্গল আকাশে, মঙ্গল ইহলোকে, মঙ্গল পর-

লোকে। চতুর্দ্দিক হইতেই মঙ্গল আসিয়া তোমার হৃদয়কে শান্তি-সলিলে অভিষিক্ত করিবে ও সমস্ত পাপ-তাপ দূরে পলায়ন করিবে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

দ্বিতীয় উপদেশ।

৫৫ ব্রাহ্ম সম্বৎ ২ আষাঢ়।

সংসার-সমুদ্রে তরঙ্গের এক মুহূর্ত্তও বিরাম নাই। সকলই চঞ্চল, সকলই অস্থির, দ্বন্দকোলাহল চারিদিকেই। মৃত্যুর সঙ্গে জীবনের সঙ্গে, সুখের সঙ্গে দুঃখের সঙ্গে, ভ্রম-প্রমাদ মোহের সঙ্গে জ্ঞান-ধর্ম্মের সঙ্গে সংগ্রামের আর অবধি নাই। আমরা জীবনকে প্রাণপণে অবলম্বন করিয়া থাকি, কোন মতেই ছাড়িতে চাহি না মৃত্যু বলপূর্ব্বক জীবন কাড়িয়া লয়। আমরা সুখের ভেলায় ভাসমান হই দুঃখ আসিয়া তাহাকে অশ্রুজলে ডুবাইয়া দেয়। আমরা জ্ঞান ধর্ম্মের কূলে পৌঁছিবার জন্য স্রোতের প্রতিকূলে কায়ক্লেশে নৌকা চালনা করি ভ্রম-প্রমাদ মোহের ঝঞ্ঝা উত্থিত হইয়া আমাদিগকে অকূল পাথারে ভাষাইয়া দেয়। মহদ্ভাব যখন মস্তক উত্তোলন করে

নীচু হইতে তরঙ্গ আসিয়া তাহাকে আঘাতের উপর আঘাত করিতে থাকে। মনুষ্যের এরূপ অবস্থা কেন? পশু পক্ষীরা নিকৃষ্ট জীব কিন্তু প্রকৃতি-মাতা তাহাদিগকে অতি যত্নের সহিত লালন-পালন করেন, কিছুরই জন্য তাহাদিগকে ভাবিতে হয় না। মনুষ্য সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ জীব অথচ মনুষ্যই সর্ব্বাপেক্ষা অসহায় ইহার অর্থ কি? নিকৃষ্ট জীবেরা প্রকৃতি-মাতার ক্রোড়ের শিশু, তাই তাহাদিগকে তিনি ক্রোড়ে রাখিয়া স্তন্য পান করান। মনুষ্য প্রকৃতি-মাতার তরুণবয়স্ক কর্ম্মক্ষম পুত্র। মনুষ্যের জন্য প্রকৃতি-মাতা যাহা করিবার তাহা করিয়াছেন আর অধিক কিছু করিবেন সে ক্ষমতা তাঁহার নাই বরং তিনিই মনুষ্যের নিকট সাহায্য পাইবার অভিলাষী। প্রকৃতি মানুষ করিয়াছে তাই আমরা মানুষ হইয়াছি, প্রকৃতির ঋণ পরিশোধ করা মানুষেরই কার্য্য। প্রকৃতির ভক্তিমান এবং কৃতকর্ম্মা পুত্রেরা মাতার ঋণ পরিশোধ করিতে কত না চেষ্টা করিতেছেন। তাঁহাদের যত্নে মরুভূমি উদ্যান অট্টালিকায় সজ্জিত হইতেছে, দুর্গম অরণ্য-পর্ব্বতে যাতায়াতের পথ উন্মুক্ত হইতেছে, সম্বৎসরের সাধ্যাতীত কার্য্য নিমেষমুহূর্ত্ত দ্বারা সুনিষ্পন্ন হইতেছে, অজ্ঞানের অন্ধকার ভেদ করিয়া জ্ঞানালোক বিকীর্ণ হইতেছে; মোহের কুজ্‌ঝটিকা

অপসারিত করিয়া ধর্ম্মের বিমল প্রভা স্ফূর্ত্তি পাইতেছে।

মনুষ্যের চতুর্দ্দিকেই বিঘ্ন-বিপত্তি, কেহই তাহার সহায় নাই। প্রকৃতি মনুষ্যের জন্য অধিক কি করিবেন, তিনি যাহা করিয়াছেন তাহাই যথেষ্ট। মনুষ্যকেই প্রকৃতির সাহায্যের ভারগ্রহণ করিতে হইবে, মনুষ্যের ইহা কর্ত্তব্য কর্ম্ম। মনুষ্যের যখন জ্ঞানের উন্মেষ হইল, যখন দেখিল যে, মাতার ক্রোড়ে শয়ান থাকিলে আর চলে না তখন সে এক প্রবল অস্ত্র হস্তে করিয়া বিঘ্নবিপত্তির সহিত সংগ্রামে প্রবৃত্ত হইল। তাহার সে অস্ত্র অমোঘ অস্ত্র, তাহার নাম সাধন।

সাধন মনুষ্যেরই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ সকলই সাধন-সাপেক্ষ। সাধন পশু পক্ষীদের জন্য নহে। পশু পক্ষীরা বিনা সাধনেই সিদ্ধ। গায়ক পক্ষী কোন গুরুর নিকট গান শিক্ষা করে না, মধুমক্ষিকা কোন বিদ্যালয়ে জ্যামিতি শিক্ষা করে না, সিংহ-ব্যাঘ্র কোন ভীমার্জ্জুনের নিকট ব্যায়াম শিক্ষা বা অস্ত্র শিক্ষা করে না, অথচ স্বকার্য্যে সকলেই পারদর্শী। কিন্তু এমন একজন মনুষ্য কোথায় যিনি মনুষ্যোচিত কার্য্যে পারদর্শী?

মনুষ্যের মহত্তম সিদ্ধির প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভগবদ্গীতা বলিয়াছেন "মনুষ্যানাং সহস্রেষু কশ্চিৎ

যততি সিদ্ধয়ে” সহস্রের মধ্যে যদি একজন সিদ্ধি-লাভের জন্য যত্ন করেন! কিন্তু আর এক দিকে দেখা যায় যে, সিদ্ধিলাভের জন্য যত্ন না করিলে মনুষ্য কখনই সুস্থ হইতে পারে না। মনুষ্য যদি সাধন-ব্যতিরেকে কুশলে কালযাপন করিতে পারিত তবে তাহার হস্তে আর কোন কার্য্য থাকিত না, তাহার ইচ্ছার কোন প্রতিবন্ধক থাকিত না, সুখ-ভোগই তাহার একমাত্র কার্য্য হইত, ভোগেই মনুষ্যের জীবন অবসান হইত। কিন্তু এরূপ অবস্থায় মনুষ্যের মন তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। ভোগ কথাটাই মনুষ্যের শ্রবণ-কটু! মনুষ্যের দৃষ্টি এমনি দূর-দৃষ্টি, মনুষ্যের আশা এমনি দূরারোহী, মনুষ্যের হৃদয় এমনি প্রশস্ত যে, কোন ভোগই সে দৃষ্টিতে গ্রাহ্য হয় না, কোন ভোগই সে আশাকে হাত বাড়াইয়া পায় না, কোন ভোগই সে হৃদয়কে পূর্ণ করিতে পারে না। মনুষ্য যে ভোগ চায় সে ভোগ জগতের কোথাও পাওয়া যায় না। জগতে যাহা যত স্থায়ী হউক্ না কেন তাহাই অস্থায়ী। যাহা যত উৎকৃষ্ট হউক না কেন তাহাই দোষযুক্ত। যাহা যত বড় হউক্ না কেন তাহাই ছোটো। আমাদের পূর্ব্বতন ঋষিরা বলিয়াছেন,

“যোবৈ ভূমা তৎসুখং নাল্পে সুখমস্তি।
ভূমৈব সুখং ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্যঃ ॥”

"যিনি মহান্ তিনি সুখস্বরূপ, অল্প কিছুতে সুখ নাই, মহান্ই সুখ, মহান্‌কেই জানিতে ইচ্ছা কর"। মনুষ্যের লক্ষ্য এইরূপ উচ্চ হওয়াতে তাহার ভোগ সুদূর ভবিষ্যতে পড়িয়া গিযাছে এবং সাধনই তাহার বর্ত্তমানের উপজীবিকা হইয়াছে। পশুদিগেব ন্যায় মনুষ্য উপস্থিত ভোগকেই পরাকাষ্ঠা মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে না। মনুষ্য উচ্চ হইতে উচ্চতর মহৎ হইতে মহত্তর স্থায়ী হইতে স্থায়িতর ভোগে উত্থান করিবার জন্য সাধনকে আপনার কর্ণধার নিযুক্ত করে।

অতএব ভোগে নিশ্চিন্ত না থাকিয়া আমাদের সকলেরই উচিত সাধনে প্রবৃত্ত হওয়া। মনুষ্যের সাধন দুইরূপ, স্বার্থ-সাধন এবং পরমার্থ-সাধন। মনুষ্য-মাত্রই স্ব স্ব শক্তি অনুসারে আপন আপন স্বার্থ সাধন করিয়া থাকে। কাহাকেও বলিতে হয় না যে তুমি স্বার্থের জন্য প্রাণপণ যত্ন করিও। কোন ব্যক্তিকে যদি এরূপ দেখা যায় যে, তিনি তাঁহার স্বার্থ-সাধনে নিশ্চেষ্ট, সে কেবল তাঁহার শক্তির অভাবে, ইচ্ছার অভাবে নহে। তাঁহার শরীর মন হয় ত দুর্ব্বল, তাঁহার সাংসারিক অবস্থা হয়ত প্রতিকূল, তাঁহার আশানুরূপ ফল হয় ত সুদুর্লভ, এই জন্যই তিনি নিশ্চেষ্ট। স্বার্থের প্রতি তাঁহার যে বিরাগ হই-

য়াছে, তাহা নহে। আপনার ভোগের দিকেই স্বার্থের লক্ষ্য। কাহারো বা ভোগের আয়তন বিস্তৃত, কাহারো বা ভোগের আয়তন সঙ্কুচিত। বিতস্তি-পরিমাণ ভূমি লাভ হইলেই হয় ত একজন কৃষকের স্বার্থ সিদ্ধ হইতে পারে। যোজন-পরিমাণ ভূমি লাভ হইলেও হয় ত একজন রাজার স্বার্থ-সিদ্ধির কিছুই হয় না। যিনি যে পদের মনুষ্য, তাঁহার স্বার্থের আয়তন তাঁহার সেই পদেরই অনুরূপ। যিনি যে পদে দাঁড়াইয়া আছেন সেই পদ রক্ষা করা এবং সেই পদ বৃদ্ধি করাই তাঁহার স্বার্থ।

কিন্তু সভ্য-সমাজে এমন মনুষ্য অতীব বিরল যাঁহার স্বার্থ কেবল-মাত্র স্বার্থ, নিঃস্বার্থ ভাবের চিহ্ন-মাত্রও যাহাতে নাই। সভ্যসমাজে মনুষ্য মাত্রই গৃহী। গৃহি-জনের স্বার্থ পরস্পরের স্বার্থের উপর নির্ভর করে। ইহা সকলেই জানিতেছেন প্রতি-জনেরই স্বার্থ আর পাঁচ-জনের স্বার্থের সহিত জড়িত। প্রতি-জনেরই স্বার্থের সহিত নিঃস্বার্থ ভাব কিয়ৎপরিমাণে সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। এই স্বার্থসাধন হইতে পরমার্থ-সাধন সিদ্ধি-লাভের উন্নত সোপান। মনুষ্য একদিকে যেমন গৃহবাসী আর একদিকে তেমনি জগৎবাসী। যেমন স্ত্রী পুত্রের স্বার্থের সহিত মনুষ্যের স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে, তেমনি জগতের স্বার্থের সহিত মনুষ্যের

স্বার্থ জড়িত রহিয়াছে। গৃহবাসী মনুষ্যের যেমন পিতা, জগৎবাসী মনুষ্যের সেইরূপ পরমেশ্বর। গৃহবাসী মনুষ্যের ভ্রাতা সহোদর, জগৎবাসী মনুষ্যের ভ্রাতা মনুষ্য। গৃহবাসী মনুষ্যের যেমন সৎপুত্র, জগৎবাসী মনুষ্যের সেই রূপ অনুষ্ঠিত সৎকর্ম্ম। গৃহবাসী মনুষ্যের যেমন দম্পতিপ্রেম, জগৎবাসী মনুষ্যের তেমনি বিশুদ্ধ ঈশ্বরপ্রেম। গৃহবাসী মনুষ্যের যেমন স্বার্থ, জগৎবাসী মনুষ্যের তেমনি পরমার্থ। ঈশ্বরকে পিতা জানিয়া সমস্ত মনুষ্যকে ভ্রাতা জানিয়া সকলের স্বার্থকে আপনার স্বার্থ মনে করিয়া কার্য্য করাকে পরমার্থ-সাধন কহা যায়। এক কথায় ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছার অনুগত হইয়া কার্য্য করাকে পরমার্থ-সাধন কহা যায়। পরমার্থ-সাধনেই মনুষ্যের পুরুষার্থ সিদ্ধ হয়। তাহাতেই মনুষ্যের মনুষ্যত্ব। ঈশ্বরের মঙ্গল ইচ্ছাই প্রকৃতির সর্ব্বস্ব। প্রকৃতি আমাদের সকলেরই মঙ্গলের জন্য অহোরাত্র নিযুক্ত রহিয়াছে। প্রকৃতির মঙ্গল কার্য্যের যদি আমরা প্রাণপণে সহায়তা করি তবে আমরা আপনাদেরই মঙ্গলের মূল-পত্তন করি। মনুষ্যেরা ভ্রাতৃসৌহার্দ্দে মিলিত হইয়া প্রকৃতিকে সাহায্য করিবে, মঙ্গলের সাহায্যে এবং অমঙ্গলের বিরুদ্ধে সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিবে ইহাই মনুষ্যের প্রকৃতি-সিদ্ধ। কিন্তু তাহা না করিয়া মনুষ্য যখন

পরস্পরের বিপক্ষতাচরণে প্রবৃত্ত হয়, অমঙ্গলের সাহায্যে এবং মঙ্গলের বিরুদ্ধে কোন চেষ্টারই ক্রুটি করে না তখন মনুষ্য বিকার-দশা প্রাপ্ত হয়। মনে করিও না যে আমরা উপদেষ্টার পদবীতে স্পর্দ্ধার সহিত দণ্ডায়মান হইলেই আমাদের পরমার্থ সিদ্ধ হইল। স্পর্দ্ধা, গর্ব্ব, যশোলিপ্সা, এ সমস্ত পরমার্থ হইতে শত-কোটি যোজন দূরে অবস্থিতি করে। ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি ভক্তি ও জগতের প্রতি প্রেম ইহাই পরমার্থের মূল। যিনি মনের সহিত বলিতে পারেন

"লোকেশ চৈতন্যমযাধিদেব মঙ্গল্য বিষ্ণো ভবদাজ্ঞয়ৈব।
হিতায় লোকস্য তব প্রিয়ার্থং সংসারযাত্রামনুবর্ত্তযিষ্যে।"

"হে লোকের অধিপতি, চৈতন্যময় অধিদেব, হে মঙ্গলময় সর্ব্বময় বিভো, লোকের হিতের জন্য এবং তোমার প্রিয় অভিপ্রায় সাধনের জন্য আমি সংসার-যাত্রার অনুবর্ত্তী হইব" তিনিই যথার্থ পরমার্থ-সাধনে ব্রতী হইয়াছেন! যেখানে ঈশ্বরের প্রতি প্রীতি-ভক্তি আমাদের মনকে আর্দ্র করিবে, হায়, সেখানে আমাদের আপনাদের প্রভুত্ব, আত্মশ্লাঘা, অলীক গর্ব্ব আস্ফালন, উপহাস-জনক স্পর্দ্ধা, আমাদের হৃদয়কে কঠোর পাষাণে আবৃত করে, ইঁহা আমাদের কিরূপে

সহ্য হয়? যেখানে মনুষ্যেরা সদ্ভাবে সাধুভাবে মিলিত হইয়া পরস্পরের হিতের জন্য সর্ব্বদা নিযুক্ত থাকিবে, হায়, সেখানে বিবাদ-কলহ দ্বেষ-হিংসা কঠিন দুর্গ প্রতিষ্ঠা করে, ইহাই বা কিরূপে আমাদের সহ্য হয়। আমরা কি পরমার্থ-সাধন করিব না, পরমার্থ সাধনের ভানই করিব ভানই করিব! কার্য্যে বিসর্জ্জন দিয়া দিন-রাত্রি কেবল আড়ম্বরেই নিযুক্ত থাকিব। ঈশ্বর আমাদিগকে এ বিপদ্ হইতে উদ্ধার করুন।

হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদের সহায় হও, নেতা হও, তুমি আমাদিগকে বল দেও। যখন আমাদের সম্মুখে বিঘ্ন বিপত্তির তরঙ্গ উত্থিত হয়, তখন যেন আমরা চতুর্দ্দিক অন্ধকার না দেখি। তোমার অপরাজিত বল আমাদের হৃদয়ে জাগ্রত হইয়া উঠুক সহস্র বিঘ্ন প্রতিহত হইয়া ধরাশায়ী হইবে। তোমার বিমল প্রেমামৃত সিঞ্চনে আমাদের মনের সমস্ত মলিনতা প্রক্ষালিত হইয়া যাক্। নূতন প্রাণ আসিয়া আমাদের হৃদয়কে অধিকার করুক! তোমার আজ্ঞায় সমস্ত জগৎ আমাদিগকে প্রাণ দান করিতেছে, আমরাও যেন সমস্ত লোকের হিতের জন্য আমাদের প্রাণ মন উৎসর্গ করিতে পারি, আমরা যেন তোমার কার্য্যে চির দিন নিযুক্ত থাকি, তোমার জ্যোতিতে বাস করি,

তোমার ক্রোড়ে বিশ্রাম করি তুমি আমাদিগের এই প্রার্থনা পূরণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

তৃতীয় উপদেশ।

৫৫ ব্রাহ্ম সম্বৎ, ৬ শ্রাবণ।

পরমাত্মার সহিত আত্মার যোগকে অধ্যাত্মযোগ কহে। এ সম্বন্ধে ব্রাহ্মধর্ম্ম কি বলিতেছেন শ্রবণ কর। "অধ্যাত্মযোগাধিগমেন দেবং মত্বা ধীরোহর্ষশোকৌ জহাতি," "অধ্যাত্মযোগের অবলম্বন দ্বারা পরম দেবতাকে অন্তরে উপলব্ধি করিয়া ধীর ব্যক্তি হর্ষ-শোক হইতে মুক্ত হন।" অধ্যাত্ম-যোগের সাধন-কার্য্য কিরূপ তাহাও বলিয়াছেন, "প্রণবোধনুঃ শরোহ্যাত্মা ব্রহ্ম তল্লক্ষ্যমুচ্যতে। অপ্রমত্তেন বেদ্ধব্যং শরবৎ তন্ময়োভবেৎ।" প্রণব ধনু, শর জীবাত্মা, লক্ষ্য পরব্রহ্ম, অপ্রমত্ত অর্থাৎ প্রমাদ-বর্জ্জিত হইয়া আত্মাকে পরমাত্মাতে নিবিষ্ট করিতে হইবে, যেন শরের ন্যায় আত্মা পরমাত্মাতে তন্ময়ীভূত হইযা যায়।" প্রণব কি না ওঙ্কার

তাহা ধনুঃ-স্বরূপ অর্থাৎ ওঙ্কার দ্বারা আত্মাকে জাগ্রত করিতে হইবে। ওঙ্কার ঈশ্বরের শক্তিকে আমাদের স্মরণ-পথে আনয়ন করে। সে শক্তি সৃষ্টিস্থিতি প্রলয়ের শক্তি। যে শক্তি দ্বারা সূর্য্যের চক্ষু উন্মীলিত হয়, জ্ঞানের চক্ষু উন্মীলিত হয়, যে শক্তি দ্বারা সমস্ত জগৎ উদ্যম উৎসাহ ও স্ফূর্ত্তিতে জীবিত হয়, যে শক্তি দ্বারা তমসাচ্ছন্ন পৃথিবী সুপ্তিতে বিলীন হয়, সেই মহতী শক্তি স্মরণ করিয়া আমাদের আত্মার শক্তিকে জাগ্রত করিয়া তুলিতে হইবে। ওঙ্কারের অবলম্বন দ্বারা আত্মা নিকৃষ্ট বৃত্তি সকলের আক্রমণ ছাড়াইয়া উঠিয়া বিমল জ্ঞানাকাশে উত্থান করিলে অবাত-কম্পিত দীপ-শিখার ন্যায় স্থির-নিষ্ঠ হইলে তবে পরমাত্মার দর্শন-লাভে কৃতার্থ হইতে পারে। তখন আত্মার জ্ঞান, প্রেম, ইচ্ছা তিনেরই সম্যক্ চরিতার্থতা সাধিত হয়। পৌত্তলিকেরা চক্ষু উন্মীলন করিলেই তাঁহার ইষ্ট দেবতার মৃৎকাষ্ঠনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তি সম্মুখে দেখিতে পা'ন এবং চক্ষু নিমীলন করিলেই সেই প্রতিমূর্ত্তির প্রতিমূর্ত্তি হৃদয়াভ্যন্তরে দেখিতে পা'ন এবং তাহাতেই তিনি তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত প্রেম স্থাপন করেন। ব্রাহ্ম তাহাতে সন্তুষ্ট হইতে পারেন না। কাল্পনিক ঈশ্বরে তিনি প্রেম স্থাপন করিতে পারেন না। সত্য ঈশ্বরকে জাগ্রত

ঈশ্বরকে পূজা করিতে পারিলেই তাঁহার মনস্কামনা সিদ্ধ হয়। সুতরাং অধ্যাত্মযোগের অবলম্বন দ্বারা পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার তাঁহার পক্ষে নিতান্ত কর্ত্তব্য।

বিষয়েতে মনের যোগ করাকে মনোযোগ কহে। পরমাত্মাতে আত্মার যোগ করাকে অধ্যাত্ম-যোগ কহে। মনোযোগ ব্যতিরেকে বাহ্য বিষয় কাহারো উপলব্ধিগম্য হয় না। অধ্যাত্মযোগ ব্যতিরেকে পরমাত্মা কাহারো উপলব্ধিগম্য হন না। কত সময়ে এরূপ দেখা যায় যে, নিদ্রিত ব্যক্তির চক্ষু উন্মীলিত রহিয়াছে, তাঁহার শ্বাস প্রশ্বাস চলিতেছে, অথচ সম্মুখবর্ত্তী একটি বিষয়ও তাঁহার দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। ইহার কারণ কেবল এই যে, তাঁহার চক্ষুরিন্দ্রিয়ের দ্বারে মন উপস্থিত নাই। আমাদের মনোযোগের অভাবে কোন বস্তু যদি আমাদের চক্ষু এড়াইয়া যায়, তবে সেই মাত্র প্রমাণের বলে আমরা বলিতে পারি না যে, সে বস্তু প্রত্যক্ষের অগোচর। নৈশ আকাশমণ্ডলে আমরা যদি ধ্রুব নক্ষত্র খুঁজিয়া না পাই, তবে তাহাতে ইহাই বুঝাইবে যে, আমাদের মনোযোগের ত্রুটি হইয়াছে। ইহা প্রমাণ হইবে না যে, ধ্রুব নক্ষত্র মানব-চক্ষুর অগোচর। সেইরূপ যদি আমরা আত্মাতে পরমাত্মার উপলব্ধি করিতে না পারি তবে তাহাতে কেবল ইহাই প্রকাশ পাইবে যে,

আমাদের অধ্যাত্মযোগের ত্রুটি হইয়াছে, তদ্ভিন্ন তাহাতে এমন কিছু প্রমাণ হইবে না যে, পরমাত্মা আমাদের উপলব্ধিগম্য নহেন। বিষয়-বিশেষ প্রত্যক্ষ করিতে হইলে মনোযোগই যেমন তাহার একমাত্র উপায়, সেইরূপ পরমাত্মাকে অন্তরে উপলব্ধি করিতে হইলে, অধ্যাত্মযোগই তাহার একমাত্র উপায়।

অনেকে বলেন যে, মনের স্থৈর্য্যই অধ্যাত্মযোগ। এমন কি তাঁহারা এ পর্য্যন্তও বলিতে ত্রুটি করেন না যে, "অধ্যাত্মযোগে মনঃস্থৈর্য্যই সার সংকল্প, ঈশ্বরোপাসনা তাহার একতম উপায়,মনঃস্থৈর্য্যই সাধকের মুখ্য প্রয়োজনীয়, ঈশ্বরোপাসনা কেবল একটা উপলক্ষ্য মাত্র।" ইহাঁদের কি ঘোরতর মতিভ্রম। তন্মন-ভাবে কোন ব্যক্তি যখন উপন্যাস পাঠ করেন, তখন তাঁহার মনের এমনি স্থিরতা হয় যে, তাঁহাকে ডাকিলে সাড়া পাওয়া যায় না, তাহা বলিয়া তাঁহার সেই মনের স্থৈর্য্যকে কি আমরা অধ্যাত্মযোগ বলিব? মনঃ-স্থৈর্য্যই যদি সাধকের একমাত্র উদ্দেশ্য হয়, তবে ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ শ্রবণ করা অপেক্ষা আরব্য উপন্যাস পাঠ করা তাঁহার পক্ষে আশু ফলপ্রদ। সংগ্রাম ব্যতিরেকে নেপোলিয়নের মন কিছুতেই স্থৈর্য্য মানিত না, কেবল সংগ্রাম-কোলাহলের মধ্যেই তাঁহার মন

অটল স্থৈর্য্য লাভ করিত। সে স্থৈর্য্যকে কি আমরা অধ্যাত্মযোগ বলিব? বিষয়ের মোহিনী শক্তি দ্বারা আমাদের মন যখন তাহাতে প্রবল বেগে আকৃষ্ট হয়, তখন আমাদের মনের খুবই একাগ্রতা হয়, খুবই স্থৈর্য্য হয়, কিন্তু তাহাতে অধ্যাত্মযোগের ব্যাঘাত ভিন্ন সাহায্য কিছুই হয় না। অতএব সাধকের এইটি মনে রাখা নিতান্ত আবশ্যক যে, বিষয়ের প্রতি মনের যে যোগ তাহা অধ্যাত্মযোগ নহে, তাহা মনোযোগ মাত্র। পরমাত্মাতে আত্মার যে, যোগ, তাহাই অধ্যাত্মযোগ।

মন স্বভাবতঃ চঞ্চল, বিষয়-বিশেষের অবলম্বন পাইলে তাহা কিয়ৎক্ষণের জন্য স্থৈর্য্য লাভ করিতে পারে, ইহা দেখিয়া পণ্ডিত ব্যক্তিরাও দেবদেবীর প্রতিমাকে সম্মুখে রাখিয়া তাহার প্রতি মনঃসমাধা করিয়া থাকেন। কিন্তু অধ্যাত্মযোগের সাধন-পদ্ধতি সেরূপ নহে। মনের ক্ষণোত্তেজিত শাখা-বৃত্তির চরিতার্থতা স্বতন্ত্র এবং সমুদায় মনোবৃত্তি-সমন্বিত সমগ্র আত্মার চরিতার্থতা স্বতন্ত্র। শেষোক্ত প্রকার সমগ্র চরিতার্থতাই অধ্যাত্মযোগের উদ্দেশ্য। ইহার তাৎপর্য্য একটু বিস্তার করিয়া বলা আবশ্যক।

যখন আমরা শুষ্ক বিজ্ঞানের আলোচনায় মনঃসমাধান করি তখন আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি সবিশেষ চরি-

তার্থতা লাভ করে কিন্তু প্রীতি ভক্তি প্রভৃতি আর আর অনেক মনোবৃত্তি পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। যখন আমরা রামায়ণ প্রভৃতি কাব্য শাস্ত্রে মনঃ সমাধান করি, তখন আমাদের হৃদয়ের প্রীতিভক্তি স্নেহ-করুণা প্রভৃতি সবিশেষ চরিতার্থতা লাভ করে, কিন্তু বুদ্ধি-বৃত্তি তাহার অনেক পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। যখন আমরা কোন বীর-চরিত পাঠ করি তখন আমাদের জয়েচ্ছা সবিশেষ চরিতার্থতা লাভ করে, কিন্তু আর আর বহু-তর মনোবৃত্তি পশ্চাতে পড়িয়া থাকে। বিশেষ বিশেষ বিষয়েতে মনের যোগ সাধন দ্বারা বিশেষ বিশেষ মনোবৃত্তির চরিতার্থতাই সাধিত হয়, সমুদায় মনের চরিতার্থতা সাধিত হয় না। সম্মুখবর্ত্তি বিষয় দ্বারা যে মনোবৃত্তি উত্তেজিত হয় সেই মনোবৃত্তিই চরিতার্থতা লাভ করে। যে বৃত্তিগুলি প্রসুপ্ত থাকে সে গুলি অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। ক্ষণোত্তেজিত উপ-স্থিত মনোবৃত্তির চরিতার্থতা সাধন অধ্যাত্মযোগের উদ্দেশ্য নহে। অধ্যাত্ম-যোগের উদ্দেশ্য অতীব মহান। পবিত্র-জ্ঞান-প্রেম-ধর্ম্ম-সমন্বিত যে আত্মা সেই আত্মার সম্যক চরিতার্থতাই অধ্যাত্মযোগের উদ্দেশ্য। বিষ-য়েতে মনঃসমর্পণ দ্বারা সে উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে না। সত্য-সুন্দর-মঙ্গল পরমাত্মাতে আত্মসমর্পণ করাই সে উদ্দেশ্য সাধনের একমাত্র উপায়। পশু পক্ষী-

দিগের মন পার্থিব বিষয় দ্বারা সর্ব্বতোভাবে গ্রস্ত হইয়া থাকে। তাহাদের মনের এক কোণও অবশিষ্ট থাকে না। গায়ক বিহঙ্গেরা সমুদায় মনের সহিত গান করে, সিংহ ব্যাঘ্র সমুদায় মনের সহিত জীব হিংসা করে, মধুমক্ষিকা সমুদায় মনের সহিত মধুচক্র নির্ম্মাণ করে, কিন্তু মনুষ্য পার্থিব বিষয়ে যতই কেন মনের সহিত নিযুক্ত থাকুক না তাহার ভিতরে অসীম গভীরতা অবশিষ্ট থাকিয়া যায়। সেখানকার সেই গম্ভীর নিস্তব্ধ শূন্যতা পরমাত্মা ভিন্ন আর কিছুরই দ্বারা পূর্ণ হইবার নহে। পরমাত্মা ভিন্ন আর কিছুতেই আত্মার ক্ষোভ শান্তি হইতে পারে না।

মনের সহিত বিষয় অবলম্বন করিয়া যেমন আমরা মনের ক্ষণিক তৃপ্তি সাধন করিয়া থাকি, আইস আমরা, সেইরূপ সমুদায় আত্মার সহিত পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া আত্মার চিরন্তন শান্তির সোপান প্রতিষ্ঠা করি। সমস্ত সংসার সমস্ত ব্রহ্মাণ্ড বিস্মৃত হইয়া, এই সুন্দর মুহূর্ত্তে আমরা সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত পরমাত্মাতে সংযুক্ত হই। আমাদের আত্মার অন্তরতম গভীরতম প্রার্থনার উৎস, আইস, আমরা তাঁহার প্রতি উন্মুক্ত করিয়া দিই। তিনি অজস্র ধারে তাঁহার প্রসাদ-বারি বর্ষণ করিবেন। হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদের আত্মাতে আবির্ভূত হও। সমুদায়

ব্রহ্মাণ্ডে তোমার নাম ধ্বনিত হউক, তোমার মহিমা প্রভাসিত হউক। তোমার প্রেমমুখ যেন আমাদের মোহ-মেঘ দ্বারা আচ্ছন্ন না থাকে। তোমার সহিত যুক্ত হইয়া আমরা যেন তোমার প্রেমে উৎফুল্ল হই। তোমার আদেশে তোমাকে অবলম্বন করিয়া যেন সমুদায় কর্ত্তব্য কার্য্য নির্ব্বাহ করি ও সংসারের সমুদায় বিঘ্ন বিপত্তি অতিক্রম করিয়া তোমার জ্যোতির্ম্ময় মহিমার মধ্যে অবস্থান করি, এই আমাদের প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ম্।

চতুর্থ উপদেশ।

৫৫ ব্রাহ্ম সম্বৎ ২ ভাদ্র।

ব্রাহ্মসমাজের, ব্রাহ্ম-পরিবারের এবং প্রতি ব্রাহ্মের একবার স্মরণ করিয়া দেখা উচিত কি নিমিত্তে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচার করিতেছি, কি নিমিত্তে ব্রাহ্মধর্ম্মানু-মোদিত ক্রিয়া-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছি, কি নিমিত্তে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছি? এই নিমিত্তে যে, জগতে ব্রহ্মের নাম ধ্বনিত হউক, পরিবারে ব্রহ্মের প্রসাদ-বারি অবতীর্ণ হউক, আত্মা ব্রহ্মের শান্তিতে অভিসিক্ত হউক। একথাটি যেমন সহজ ইহার সাধন-

পদ্ধতি সেরূপ নহে। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত সাধন-পদ্ধতি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে অতীব স্পষ্ট কথায় এবং অতীব অল্প-কথায় উপদিষ্ট হইয়াছে। যেমন মহোচ্চ হিমালয়ের কক্ষ হইতে গঙ্গা যমুনা সরস্বতী সুবিমল সূক্ষ্ম ধারায় ত্রিধা বিনিঃসৃত হয়, সেইরূপ আমাদের পুরাতন ঋষি-দিগের পবিত্র হৃদয় হইতে এই তিনটি সাধু উপ-দেশ বিনিঃসৃত হইয়াছে "সত্যান্ন প্রমদিতব্যং ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যং কুশলান্ন প্রমদিতব্যং" সত্য হইতে বিচ্যুত হইবে না, ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইবে না, মঙ্গল হইতে বিচ্যুত হইবে না।

সত্য হইতে বিচ্যুত হইবে না, ইহা শুনিতে অতি সহজ কিন্তু ইহার সাধন অতীব সুকঠিন। মুখে মিথ্যা বলিব না, কার্য্যে মিথ্যা আচরণ করিব না, হৃদয়ে মিথ্যাকে স্থান দিব না, কায়-মনোবাক্যে সত্যের অনুষ্ঠান করিব ; ইহা যে কত সাধনের কার্য্য তাহা সাধকই জানেন। এইরূপ সত্য অনুষ্ঠানের প্রতি লক্ষ্য করিয়াই ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন, "অদ্ভির্গাত্রাণি শুদ্ধন্তি মনঃ সত্যেন শুদ্ধতি" জলের দ্বারা যেমন শরীর নির্ম্মল হয়, সত্যের দ্বারা সেইরূপ মন নির্ম্মল হয়। সত্য শুধু মুখে-মুখে বিচরণ করিলে তাহাতে কিছু হয় না। কেবল যখন সত্য হৃদয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে তখন তাহাতে মনের সমস্ত মালিন্য

প্রক্ষালিত হইয়া যায়। (১) সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা এবং মিথ্যার প্রতি বিরাগ সত্য-সাধনের মূল। (২) তাহার পরে সত্য-জিজ্ঞাসা। (৩) তাহার পরে সত্য উপার্জ্জন এবং মিথ্যা-পরিবর্জ্জন। (৪) তাহার পরে সত্য-অনুশীলন। (৫) তাহার পরে সত্য প্রচার। সত্যের সাধন এইরূপ পাঁচটি অঙ্গে বিভক্ত। সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা মনুষ্যের স্বভাব-সিদ্ধ। শরীরের পুষ্টির জন্য অন্ন যেমন প্রয়োজনীয়, হৃদয়ের পুষ্টির জন্য প্রেম যেমন প্রয়োজনীয়, জ্ঞানের পুষ্টির জন্য সত্য সেইরূপ প্রয়োজনীয়। সকলেই যেমন অন্ন-দ্বারা স্ব স্ব শরীরের পুষ্টিসাধন করিতে অভিলাষী, সকলেই সেইরূপ সত্য-দ্বারা স্ব স্ব জ্ঞানের পুষ্টি-সাধন করিতে অভিলাষী। অন্ন যেমন সাধারণতঃ সকল মনুষ্যেরই সেবনীয়, সত্যও সেইরূপ সর্ব্বজনসেব্য। অন্নে অরুচি যেমন শারীরিক রোগের অবিচ্ছেদ্য সহচর, সেইরূপ সত্যে অশ্রদ্ধা আধ্যাত্মিক রোগের অবিচ্ছেদ্য সহচর। সত্যে যাঁহার শ্রদ্ধা নাই সত্যং জ্ঞানমনন্তং পরব্রহ্মকে তিনি প্রমাণ-দ্বারা আয়ত্ত করিতে গিয়া অকূল পাথারে নিপতিত হ'ন। চক্ষুর দোষবশতঃ যিনি সূর্য্যকে দেখিতে পান না তিনি প্রদীপ ধরিয়া সূর্য্যকে দেখিবার জন্য চেষ্টা করিলে তাঁহার সে চেষ্টা কেমন করিয়া সফল হইবে? আত্মার অপবিত্রতা-দোষে

যিনি পরমাত্মাকে, সকল সত্তার মূল সত্তাকে, জ্ঞানের জ্ঞানকে, প্রাণের প্রাণকে অন্তরে বাহিরে উপলব্ধি না করেন তিনি যুক্তির প্রভাবে তাঁহাকে আয়ত্ত করিতে চেষ্টা করিলে, তাঁহার সে চেষ্টা ত ব্যর্থ হইবারই কথা। মূল জ্ঞানকে প্রমাণ-দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করা যে, কি হাস্যজনক তাহা আমাদের দেশের দর্শনকারেরা সুন্দর রূপে অবগত ছিলেন। যথা

"মানং প্রবোধয়ন্তং বোধং যে মানেন বুভুৎসন্তে।
এধোভিরেব দহনং দগ্ধুং বাঞ্ছন্তি তে মহাসুধিয়ঃ॥"

প্রমাণকে প্রবোধিত করিতেছে যে মূলবর্ত্তী জ্ঞান, সেই জ্ঞানকে যাঁহারা প্রমাণ-দ্বারা জানিতে ইচ্ছা করেন, সেই সকল মহা পণ্ডিতেরা কি করেন? না, ইন্ধন-কাষ্ঠকে দগ্ধ করিবে যে অগ্নি সেই অগ্নিকে ইন্ধন-কাষ্ঠ দ্বারা দহন করিতে ইচ্ছা করেন। নির্ম্মল অন্তঃকরণের শ্রদ্ধা আমাদের জ্ঞানচক্ষুর অঞ্জন-স্বরূপ, তাহার অভাব হইলে আমাদের জ্ঞান কুতর্ক কুহেলিকা-দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া যায় ও পরমাত্মার জ্যোতি অন্তরিত হইয়া যায়। প্রথমে সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা তাহার পর সত্য-জিজ্ঞাসা। জলের সম্বন্ধে যেমন পিপাসা সত্যের সম্বন্ধে সেইরূপ জিজ্ঞাসা। "জিজ্ঞাসা" অর্থাৎ জানিবার ইচ্ছা। জিজ্ঞাসা কিরূপে

কর্ত্তব্য তাহা ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থের গোড়াতেই উপদিষ্ট হইয়াছে। যথা,

"তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ। তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় সমান্বিতায় যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতোব্রহ্মবিদ্যাং।"

"পরব্রহ্মের বিশেষ জ্ঞান-লাভার্থে আচার্য্য-সন্নিধানে শিষ্য গমন করিবেন; সেই জ্ঞানাপন্ন আচার্য্য শিষ্যকে সম্যক্ শান্ত সমান্বিতচিত্ত দেখিয়া যে বিদ্যা দ্বারা অক্ষর সত্য পুরুষকে জানা যায় তাহার উপদেশ করিবেন।" "তদ্‌জ্ঞানার্থং" নহে কিন্তু "তদ্‌বিজ্ঞানার্থং" "স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ" পরব্রহ্মের জ্ঞান লাভার্থে নহে কিন্তু পরব্রহ্মের বিশেষ জ্ঞান-লাভার্থে আচার্য্যসন্নিধানে শিষ্য গমন করিবেন। এই কথাটির প্রতি সবিশেষ প্রণিধান করা কর্ত্তব্য। পূর্ব্ব হইতেই পরব্রহ্মের প্রতি যাঁহার শ্রদ্ধা আছে, সকল সত্যের মূল সত্য একজন আছেন ইহা যাঁহার ধ্রুব জ্ঞান, তিনি তাঁহার সেই জ্ঞানকে দৃঢ় করিবার জন্য সেই জ্ঞানের গভীরতা এবং বিস্তৃতি সাধন করিবার জন্য সেই জ্ঞানকে যথোচিত পরিপোষণ এবং পরিবর্দ্ধন করিবার জন্য গুরুর নিকট গমন করিবেন। সূর্য্যের ধ্রুব অস্তিত্বের প্রতি যাঁহার শ্রদ্ধা নাই, যাঁহার বিশ্বাস যে, সূর্য্য আমাদের মনের ভ্রান্তি,

আজ আছে, কাল নাই, তাঁহাকে কেহ বলে না যে, তিনি জ্যোতিষ শিক্ষার্থে আচার্য্যের নিকট গমন করুন। সূর্য্যের আশ্চর্য্য প্রভাব দেখিয়া সূর্য্যের প্রতি যাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, জ্যোতিষ শাস্ত্রের উপদেশ গ্রহণ তাঁহাকেই শোভা পায়। সেইরূপ ব্রহ্মের প্রতি যাঁহাদের যথোচিত শ্রদ্ধা বর্ত্তমান আছে, ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা তাঁহাকেই শোভা পায়। শিষ্যের জ্ঞানকে সৃষ্টি করিয়া তোলা গুরুর কার্য্য নহে, শিষ্যের আত্মাতে যে জ্ঞান আছে তাহাকে উদ্বোধিত করিয়া দেওয়াই গুরুর কার্য্য। আপনার জ্ঞানের মূল-জ্ঞানের প্রতি যাহার শ্রদ্ধা নাই সে ব্যক্তির ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা আন্তরিক ব্রহ্ম-জিজ্ঞাসা নহে। যাঁহার চিত্ত প্রশান্ত এবং যিনি শমান্বিত, এক কথায় যিনি শ্রদ্ধাবান্ তিনিই ব্রহ্মজ্ঞান লাভের অধিকারী। তাঁহার ব্রহ্মজিজ্ঞাসাই তাঁহার হৃদয়ের পিপাসা, মুখের ভাষা-মাত্র নহে। এই জন্য কথিত হইয়াছে,

"তস্মৈ স বিদ্বান্ সম্যক প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়"

"সম্যক্‌রূপে যিনি প্রশান্তচিত্ত, সম্যকরূপে যিনি শমান্বিত, গুরু তাঁহাকেই ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করিবেন।" অতএব প্রথমে সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা, তাহার পরে সত্য-জিজ্ঞাসা। শ্রদ্ধা আত্মার স্বাস্থ্য, জিজ্ঞাসা আত্মার পিপাসা। শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তির জিজ্ঞাসা এবং

জ্বর-রোগীর পিপাসা উভয়ই বিকারের লক্ষণ! শারী-রিক পুষ্টি উপার্জ্জন করিতে হইলে অগ্রে যেমন ক্ষুধা আবশ্যক হয় এবং পরে যেমন অন্ন ভোজন আবশ্যক হয়, সত্য উপার্জ্জন করিতে হইলে অগ্রে সেইরূপ জিজ্ঞাসা আবশ্যক হয়, পরে গুরূপদেশ আবশ্যক হয়। চিকিৎসক যেমন অগ্রে রোগীর ক্ষুধা জন্মাইয়া দিয়া পরে পথ্য প্রদানের ব্যবস্থা করিয়া দেন, গুরুর সেইরূপ কর্ত্তব্য যে, অগ্রে শিষ্যের জিজ্ঞাসা উদ্বোধিত করিয়া পরে তদুপযোগী সত্যের উপদেশ করেন। অনেকে শিক্ষার দোষে নানা গ্রন্থের নানা সত্যে এরূপ ভারাক্রান্ত হইয়া পড়েন যে, অজীর্ণ অন্নের ন্যায় ইষ্টসাধন করিতে গিয়া তাহা তাঁহাদের প্রভূত অনিষ্টের কারণ হইয়া উঠে। শিষ্যের কর্ত্তব্য যে, তিনি যতটুকু সত্য উপার্জ্জন করেন তাহা তিনি বুদ্ধিতে সুন্দর-রূপে আয়ত্ত করেন। গুরুর নিকট হইতে যে সত্য উপার্জ্জন করিয়াছেন তাহা তিনি রীতিমত অনুশীলন করেন। অনেকে সত্য উপার্জ্জন করিবা-মাত্রেই তাহা অন্যের নিকট প্রচার করিতে উদ্যত হ'ন। তাঁহারা নিজে যাহা ভাল করিয়া বোঝেন না, তাহা অন্যকে বুঝাইতে যা'ন। তাঁহারা অন্যকে সত্য বুঝাইতে গিয়া আপনাদের বুদ্ধিমত্তা বুঝাইতেই ব্যস্ত হ'ন,। অন্যেরাও তাঁহা-

দের বুদ্ধিমত্তা স্বীকার করেন। ক্রমে তাঁহাদের নিজেরও এইরূপ এক কুসংস্কার জন্মে যে, আমি যাহা বুঝি তাহাই সত্য, আমি যাহা না বুঝি তাহা কিছুই নহে। ইহার ফল এই হয় যে, তাঁহাদের মনো-মধ্যে সত্যের দ্বার একেবারেই রুদ্ধ হইয়া যায় ও ঘোরতর মিথ্যা অভিমান আসিয়া সত্যের সিংহাসনে উপবিষ্ট হয়। এইরূপে অন্যের ইষ্ট-সাধন করিতে গিয়া আপনার এবং অন্যের উভয়েরই অনিষ্ট সাধন করা হয়। অতএব অন্যের নিকট সত্য প্রচার করিবার পূর্ব্বে অগ্রে আপনি ভাল করিয়া সত্যের অনুশীলন করা কর্ত্তব্য। সদ্গ্রন্থ পাঠ করা কর্ত্তব্য, সৎসঙ্গ করা কর্ত্তব্য, পবিত্র ঋষিদিগের সরলান্তঃকরণের বাক্য-সকল আন্তরিক শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ মনন করা কর্ত্তব্য। এইরূপ প্রণালীতে চলিয়া সাধক যখন সত্যের পথে সমুচিত অগ্রসর হ'ন, তখন সেই সত্য জন-সমাজে প্রচার করা তাঁহার কর্ত্তব্য কার্য্য হইয়া উঠে। যিনি গুরুর গুরুতর ভারবহন করিবার উপযুক্ত হইয়াছেন সে কার্য্যে বিধিমতে প্রবৃত্ত হওয়া তাঁহারই কর্ত্তব্য। উপযুক্ত অধিকারীগণকে জ্ঞান-শিক্ষা দেওয়া তাঁহারই কর্ত্তব্য। সত্য-সত্যই যাহাতে শ্রদ্ধাবান্ সত্য-জিজ্ঞাসুর সংশয়ান্ধকার দূরীভূত হয়, জ্ঞান-চক্ষু উন্মীলিত হয়, মনের মালিন্য প্রক্ষালিত

হইয়া যায় তদুপযুক্ত উপদেশ প্রদান করা তাঁহারই কর্ত্তব্য। সত্যের প্রতি শ্রদ্ধা, সত্যের জিজ্ঞাসা, সত্যের উপার্জ্জন, সত্যের অনুশীলন, সত্যের প্রচার, এইরূপ সহজ পদ্ধতি অনুসারে যাঁহারা সত্যের পথে অগ্রসর হ'ন, সত্য তাঁহাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাদিগকে বিশুদ্ধ ধর্ম্মের পথ প্রদর্শন করেন। 'সত্যান্ন প্রমদিতব্যং' এইটি ঋষিদিগের প্রথম উপদেশ। দ্বিতীয় উপদেশ 'ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যং,' তৃতীয় উপদেশ 'কুশলান্ন প্রমদিতব্যং'। অদ্য "সত্যান্ন প্রমদিতব্যং" ইহার ব্যাখ্যা করিবার পূর্ব্বে সত্যের ধারাবাহিক ক্রম-পদ্ধতি প্রদর্শিত হইল। সত্যের পালন যাহা ধর্ম্মের মূল তাহা আগামী বারে ব্যাখ্যাত হইবে এবং ক্রমে 'সত্যান্ন প্রমদিতব্যং ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যং কুশলান্ন প্রমদিতব্যং' ইহার সম্বন্ধে ঋষিদিগের কিরূপ অভিপ্রায় তাহা ব্যাখ্যাত হইবে।

হে পরমাত্মন্! তুমি সকল সত্যের মূল সত্য, তুমি জল-স্থল শূন্য পরিপূর্ণ করিয়া আমাদের সম্মুখে বিরাজমান রহিয়াছ এবং আমাদের প্রাণ মন হৃদয়কে পরিপূর্ণ করিয়া আমাদের আত্মাতে বিরাজমান রহিয়াছ। তুমি আমাদের পূর্ব্বতন গুরুরও গুরু, তোমাকে আমরা প্রণাম করিতেছি; তুমি আমাদের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলন করিয়া দেও, যাহাতে জগতের আদি হইতে

অন্ত পর্য্যন্ত তোমাকে দেদীপ্যমান দেখিতে পাই, আত্মার অভ্যন্তর হইতে সকল বস্তুর সকল জীবের অভ্যন্তর পর্য্যন্ত তোমাকে প্রত্যক্ষবৎ জাগ্রত অবলোকন করি এবং হৃদয়ের নিভৃত প্রদেশ তোমাতে অর্পণ করিয়া কামনার সমস্ত বিষয় উপভোগ করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

পঞ্চম উপদেশ।

৫৫ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬ আশ্বিন।

ব্রাহ্মধর্ম্মের এই উপদেশটি আপামর সাধারণ সকল লোকেরই মনে গ্রথিত হওয়া কর্ত্তব্য যে "ধর্ম্মান্ন প্রমদিতব্যং" ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত হইবে না। ধর্ম্ম উপদেশ দেওয়া ধর্ম্ম প্রচার করা কঠিন নহে, ধর্ম্ম পালন করাই কঠিন; কিন্তু পূর্ব্বতন ঋষিরা বলিয়াছেন "ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু" ধর্ম্ম সকলেরই পক্ষে মধুস্বরূপ; ধর্ম্ম এক দিকে যেমন কঠোর আর এক দিকে তেমনি মধুর।

প্রথম পক্ষে ধর্ম্ম অতীব কঠোর। অস্মাদের দেশের দর্শনকারেরা বলেন "নোদনালক্ষণোধর্ম্মঃ;" নোদনা কিনা বিধির প্রবর্ত্তনা; বিধির প্রবর্ত্তনা অনু-

সারে কার্য্য করার নামই ধর্ম্ম-সাধন, অর্থাৎ বিহিত কর্ম্মের অনুষ্ঠান এবং নিষিদ্ধ কর্ম্মের পরিবর্জ্জন। জর্ম্মন দেশীয় দর্শনকারেরা ধর্ম্মের এইরূপ লক্ষণ করেন যে, ধর্ম্ম কি? না দ্বিধাবর্জ্জিত দ্বিরুক্তিবর্জ্জিত অনুশাসন। নোদনা শব্দের তাৎপর্য্যও ঠিক তাই। নোদনা কিম্বা দ্বিধাবর্জ্জিত অনুশাসন কাহাকে বলে তাহা স্পষ্ট বুঝিতে হইলে এইটির প্রতি প্রণিধান করা কর্ত্তব্য যে, মনুষ্যমাত্রই দেশ-কাল-অবস্থা দ্বারা পরিচ্ছিন্ন, আর, প্রত্যেক দেশকাল অবস্থায় তাহার কর্ত্তব্য কার্য্য একটি মাত্র, অকর্ত্তব্য কার্য্য অসংখ্য। সমস্ত অকর্ত্তব্য কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া সেই কর্ত্তব্য কার্য্যটি অনুষ্ঠান করাই ধর্ম্ম; ও যে আধ্যাত্মিক বল দ্বারা সেই কার্য্যটি অনুষ্ঠিত হয় তাহারই নাম নোদনা, তাহারই নাম দ্বিধাবর্জ্জিত দ্বিরুক্তি-বর্জ্জিত অনুশাসন। ভৌতিক বিজ্ঞান বলে যে, অবাধিত গতিমাত্রই সরল পথ অবলম্বন করে, ও যে গতি বক্র পথ অবলম্বন করে তাহা বল-বিশেষ দ্বারা বাধিত বা নিয়ন্ত্রিত হইয়াই সেরূপ করে। আরও বলে যে, দুই স্থানের মধ্যবর্ত্তী সরল পথ একটি মাত্র কিন্তু বক্র পথ অসংখ্য। ধর্ম্মসম্বন্ধেও সেইরূপ বলা যাইতে পারে যে, অবাধিত আত্মার অবলম্বনীয় পথই ধর্ম্মের পথ, আর এই যে, দেশ কাল অবস্থার সীমাভ্যন্তরে সেই ধর্ম্মের

পথ কর্ত্তব্যের পথ একটি মাত্র, অকর্ত্তব্যের পথ অসংখ্য। সেই অসংখ্য অকর্ত্তব্যের পথ পরিত্যাগ করিয়া সেই একটি কর্ত্তব্যের পথ অবলম্বন করিতে হইবে। কি কঠিন কার্য্য! এই জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে "ক্ষুরস্য ধারা নিশিতা দুরত্যয়া দুর্গং পথস্তৎ কবয়োবদন্তি" কবিরা বলেন যে, সে পথ শাণিত ক্ষুরধারের ন্যায় দুর্গম। কিন্তু এই পথকে লক্ষ্য করিয়াই আবার ব্রাহ্মধর্ম্ম বলিয়াছেন "ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু," ধর্ম্ম সকলেরই পক্ষে মধুস্বরূপ। দুই কথারই অর্থ আছে, দুই কথার কোনটিই উপেক্ষণীয় নহে। যাঁহারা ধর্ম্মের কঠোরতার প্রতি উপেক্ষা করিয়া শুদ্ধ কেবল ধর্ম্মের মাধুর্য্যের প্রতিই মনোনিবেশ করেন, তাঁহারা পথের বিঘ্ন বিপত্তির সহিত সংগ্রামের জন্য পূর্ব্ব হইতে প্রস্তুত থাকেন না, এই জন্য তাঁহারা শীঘ্রই পরাভব প্রাপ্ত হন। আবার, যাঁহারা ধর্ম্মের মাধুর্য্যের প্রতি উপেক্ষা করিয়া শুদ্ধ কেবল কঠোরতার প্রতিই মনোনিবেশ করেন, তাঁহারা ধর্ম্মকে ব্যাঘ্র ভল্লুকের মত দেখেন, সুতরাং তাঁহাকে তাঁহারা দূর হইতেই পরিত্যাগ করেন। অতএব সাধকের ইহা জানা উচিত যে, পদ্মের মৃণাল যেরূপ কণ্টকময় ও তাহার পুষ্প যেরূপ মধুময়, সেই রূপ ধর্ম্মের অঙ্কুর কণ্টকময় কিন্তু তাহার ফল মধুময়। আরো জানা

উচিত যে, কঠোরতা ধর্ম্মের বাহ্য লক্ষণ, মাধুর্য্য তাহার আন্তরিক লক্ষণ। ধর্ম্মের অঙ্কুর কি? না তপস্যা ও সাধনা, ইহা কণ্টকময়। ধর্ম্মের ফল কি? না আত্মপ্রসাদ ইহা মধুময়। এই আত্মপ্রসাদের মাধুর্য্যই ধর্ম্মের আন্তরিক লক্ষণ। তপস্যা ও সাধনার ক্লেশ তাহার বাহ্য লক্ষণ। কেননা বাহিরের বাধা মোচনার্থেই তপস্যা ও সাধনার ক্লেশ স্বীকার করা আবশ্যক হয়। পরন্তু, আত্মার আভ্যন্তরিক স্ফূর্ত্তিই আত্মপ্রসাদের প্রস্রবণ।

আত্মপ্রসাদের মুল অন্বেষণ করিতে গেলে দেখিতে পাওয়া যায় যে, আত্মা এবং পরমাত্মার মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহাই আত্মপ্রসাদের মূল। ধর্ম্মের ভিত্তিমূল আত্মপ্রভাব। আত্মপ্রভাব পরিস্ফুট হইলে পরমাত্মা হইতে আত্মাতে যে প্রসাদবারি অবতীর্ণ হয় তাহাই আত্মপ্রসাদ। ইংরাজিতে একটি প্রবাদ আছে যে, যে ব্যক্তি আপনি আপনাকে সাহায্য করে, ঈশ্বর তাঁহাকে সাহায্য করেন, ইহারও ঐ অর্থ। আত্ম-প্রভাবই দেবপ্রসাদ আকর্ষণ করে, আত্মপ্রভাবই আত্মপ্রসাদের উপযুক্ত ক্ষেত্র। আত্মপ্রভাবরূপ ক্ষেত্রে আত্মপ্রসাদরূপ বারি নিপতিত হইয়া ধর্ম্মের মধুময় ফল উৎপাদন করে।

আর এক দিকে দেখা যায় যে, যেমন বর্ষার বারি

নিপতিত হইলে বীজ অঙ্কুরিত হয়, সেইরূপ ঈশ্বরের প্রসাদ অবতীর্ণ হইলে আত্মার প্রভাব অঙ্কুরিত হয়; অতএব ঈশ্বরের প্রসাদ প্রার্থনা করিয়া ধর্ম্মপথে অগ্রসর হওয়া ধর্ম্মসাধনের একটি প্রধান অঙ্গ। ঈশ্বরের প্রসাদই ধর্ম্মপথের পাথেয় সম্বল। ইউরোপে এককালে এইরূপ এক বীরধর্ম্ম প্রচলিত ছিল যে, বীর পুরুষেরা স্ব স্ব প্রেয়সীর প্রীতি-কামনায় দ্বন্দ্বযুদ্ধে প্রবৃত্ত হইতেন, এবং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে স্ব স্ব প্রেয়সীকে ধ্যান করিয়া তাহাদের প্রসাদ যাচ্ঞা করিতেন। এ সকল প্রথার অর্থ আর কিছু নহে আধ্যাত্মিক ঈশ্বরোপাসনায় যাঁহারা অক্ষম, তাঁহারা পার্থিব প্রেমের পাত্রকে ঈশ্বরের স্থানাভিষিক্ত করিয়া এক বস্তুর বাসনা আর এক বস্তু দ্বারা পূরণ করেন! ব্রাহ্মের কর্ত্তব্য যে, তিনি প্রকৃত ঈশ্বরের প্রসাদ যাচ্ঞা করিয়া ধর্ম্মের দুর্গম পথে দিন দিন অগ্রসর হন। ক্রমে যখন সেই দুর্গম পথ তাঁহার নিকট সুগম হইয়া যাইবে, তখন তিনি সর্ব্বান্তঃকরণের সহিত বলিতে পারিবেন "ধর্ম্মঃ সর্ব্বেষাং ভূতানাং মধু।"

ধর্ম্মসাধন দ্বারা আত্মার আধ্যাত্মিক বল তপোবল পরিস্ফুট হয়, যে বল দ্বারা বিষয়ের প্রতিকূল স্রোতে আত্মা অটল থাকিয়া আত্মপ্রসাদে পরিপ্লুত হয়, যে বল ইহকাল পরকাল সকল কালেরই অমোঘ

সহায়,সেই দেবস্পৃহনীয় প্রশান্ত অক্ষুব্ধ বল আত্মাতে আবির্ভূত হয়। সে বল শারীরিক বল নহে যে আজ আছে কাল নাই; তাহা মানসিক বল নহে যে, শ্রমে শ্রান্ত হইবে। সমস্ত জগৎ যেরূপ বলে চলিতেছে, তাহা সেই রূপ অপরাজিত অক্ষুব্ধ প্রশান্ত বল। কালিদাস বলিয়াছেন,

"ভানুঃ সকৃদ্‌যুক্ততুরঙ্গএব,
রাত্রিন্দিবং গন্ধবহঃ প্রযাতি,
শেষঃ সদৈবাহিতভূমিভারঃ
ষষ্ঠাংশবৃত্তেরপি ধর্ম্ম এষঃ।"

সূর্য্যের রথে একবার মাত্র অশ্ব যোজিত হইয়াছে, রাত্রিদিন গন্ধবহ চলিতেছে, বাসুকি নিয়তই ভূমি-ভারে আক্রান্ত রহিয়াছে, রাজাদেরও এইরূপ ধর্ম্ম। শুধু কেবল রাজাদের নহে, যে কেহ ধর্ম্ম-ব্রতে ব্রতী তাঁহারই ঐরূপ ধর্ম্ম। পূর্ব্বে বলিয়াছি যে, অধর্ম্মের বক্র পথ অসংখ্য কিন্তু ধর্ম্মের পথ একটিমাত্র সরল পথ। সেই পথই ঈশ্বরের অভিপ্রেত। আমরা সেই পথে চলিলেই ঈশ্বরের অপরাজিত শক্তি সমুদায় প্রকৃতি আমাদের সহায় হয়। আমাদের যত কিছু শক্তির অভাব সমস্তই ঈশ্বরের শক্তি দ্বারা পূরিত হয়। যিনি যথার্থ ধর্ম্মপরায়ণ তাঁহার ইচ্ছা ঈশ্বরের ইচ্ছার সহিত একতানে মিলিত হয়। সমুদায় প্রকৃতির

আন্তরিক মঙ্গল-চেষ্টার সহিত তাঁহার চেষ্টা একতানে মিলিত হয়। এইরূপ যোগের প্রভাবে সাধু ব্যক্তির আত্মার অভ্যন্তরে এরূপ এক আনন্দের উৎস খুলিয়া যায় যে, ধর্ম্মসাধনের কষ্ট আর তাঁহার নিকট কষ্ট বলিয়া বোধ হয় না। ধর্ম্ম তাঁহার নিকট মধুস্বরূপ হয়। ধর্ম্ম দ্বারা তখন তিনি ঈশ্বরকে প্রাপ্ত হ'ন—

"যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাহপি বিচাল্যতে।"

যাঁহাকে প্রাপ্ত হইলে কোন লাভই তাহা হইতে অধিক মনে হয় না, যাঁহাতে অবস্থিতি করিলে গুরু দুঃখেও মনুষ্য বিচালিত হয় না।

নানা পথের মধ্যে কোন্‌টি ধর্ম্মের পথ তাহা চিনিয়া লওয়া কখন কখন কঠিন হইয়া পড়ে। আমাদের দুই দিক্ দিয়া দুই প্রকারের বক্র পথ প্রসারিত রহিয়াছে। বাম দিক্ দিয়া নিরুৎসাহ আলস্য অনবধানতা হতশ্রদ্ধা ইন্দ্রিয়পরতা এই সকল পথ চলিয়াছে। শাস্ত্রকারেরা এই সকল পথ তামসিক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। ডাহিন দিক দিয়া ঔদ্ধত্য গর্ব্ব অহঙ্কার আত্মাভিমান স্বার্থপরতা ক্ষমাহীনতা বলদর্প এই সকল পথ চলিয়াছে। শাস্ত্রকারেরা এই সকল পথ রাজসিক বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। এ দুই প্রকার পথের মাঝখান দিয়া সত্যের, আত্মপ্রসাদের এবং মঙ্গলের

একটি সরল পথ প্রসারিত রহিয়াছে। শাস্ত্রকারেরা তাহাকেই সাত্ত্বিক নামে নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন। তাহাই ধর্ম্মের পথ। তামসিক পথের নিরুৎসাহ কখন কখন ধর্ম্মপথের শান্তির মত ভান করে। রাজসিক পথের ঔদ্ধত্যও কখন কখন ধর্ম্মপথের উৎসাহের মত ভান করে। সাধককে দুই দিক্ বাঁচাইয়া চলিতে হয়। তামসিক ইন্দ্রিয়পরতা কখন কখন ধর্ম্মপথের প্রেমের ভান করে। রাজসিক স্বার্থপরতা কখন কখন ধর্ম্মপথের আত্মনির্ভরের ভান করে। এ দুই দিকও বাঁচাইয়া চলিতে হয়। ধর্ম্মের সরল মধ্য পথের ঠিকানা পাইতে হইলে তাহার প্রধান উপায় এই যে ঈশ্বরের উপাসনা দ্বারা আত্মাকে সরল নম্র ও প্রশান্ত করা। তাহা হইলেই ধর্ম্মের সরল ও সূক্ষ্ম পথ সহজে আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হইবে। বীণাযন্ত্রের সুর বাঁধিলে তাহা হইতে যেমন সহজেই সুস্বর নিষ্ক্রান্ত হয়, তেমনি পরমাত্মার সহিত আত্মা একতান হইলে, আত্মা আপনাপনি সাত্ত্বিক ধর্ম্মপথে উন্মুখ হয়, শ্রদ্ধা ভক্তি উৎসাহ দয়া-দাক্ষিণ্য ক্ষমা প্রভৃতি সদ্গুণের বীজ আপনা-আপনি অঙ্কুরিত হইয়া উঠে।

হে পরমাত্মন্! আমরা মোহান্ধকারে আচ্ছন্ন হইয়া সংসার-সাগরে ইতস্ততঃ নীয়মান হইতেছি, তোমার

অভয় মঙ্গল-মূর্ত্তিই আমাদের সমস্ত আশা ভরসা। তুমি আমাদিগকে কোন কালেই পরিত্যাগ কর না, আমরা আমাদের আপনাদের দোষে তোমা হইতে দূরে পড়িয়া, অসহায় শিশুর ন্যায় চারিদিকে বিভীষিকা দর্শন করি। মাতার ন্যায় তুমি আমাদিগকে দেখা দিয়া আমাদের ভয়তাপ নিবারণ কর, পিতার ন্যায় তুমি আমাদিগকে মঙ্গলময় ধর্ম্মের পথ প্রদর্শন কর, যাহাতে আমরা চিরজীবন তোমাকে হৃদয়ে পাইয়া অক্ষয় ধনে ধনী হই, তোমার প্রেমরসে মগ্ন থাকিয়া যাহাতে আমরা সংসারের সকল দুঃখতাপ বিস্মৃত হই, আমাদের প্রতি সেইরূপ করুণা বিতরণ কর। তোমার করুণা আমাদের সকল পাপের মহৌষধি, সকল তাপের শান্তিবারি, অমৃতের একমাত্র প্রস্রবণ। আমাদের ব্যাকুল হৃদয় তোমাকে পাইলেই শান্তি পায়। তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া সমস্ত পাপ-তাপ হইতে আমাদিগকে রক্ষা কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

ষষ্ঠ উপদেশ।

৫৫ ব্রাহ্ম সম্বৎ ২ অগ্রহায়ণ।

মনুষ্যের কি প্রেম কি দুঃখ! যাহার প্রেম নাই তাহার দুঃখ নাই। পৃথিবীতে যদি প্রেম না থাকিত তবে কাহারো ভ্রাতৃবিয়োগ হইত না, বন্ধু-বিয়োগ হইত না, মাতৃ-বিয়োগ হইত না, পিতৃবিয়োগ হইত না, কাহারো সংসার কখন অন্ধকার হইত না। মনুষ্যের দুঃখ মনুষ্যই জানে, সে দুঃখ নিবারণের জন্য কত শত মহাত্মা অকুতোভয়ে বক্ষ পাতিয়া দিয়া দারুণ দুঃখকে আলিঙ্গন করিয়াছেন, মনুষ্যের দুঃখ মোচনের জন্য মনুষ্য প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন করিয়াছে। মনুষ্যের মৃত্যু পৃথিবীর উপরে কি নিদারুণ বজ্রাঘাত, তাহাতে পশু পক্ষী তরু-লতা পর্য্যন্ত শোকে আকুল হয়!

মনুষ্যের এত যে দুঃখ তাহা কিসের জন্য? প্রীতিই সে দুঃখের মূল এবং প্রীতিই সে দুঃখের ঔষধ! পৃথিবীর উত্তাপ যেমন আকাশের অশ্রুধারা আকর্ষণ করে আত্মার দুঃখ-তাপ সেইরূপ পরমাত্মার প্রসাদ-বারি আকর্ষণ করে। স্বয়ং ঈশ্বর মনুষ্যের দুঃখের মোচনকর্ত্তা, এবং তিনি যাহার দুঃখ মোচন

করেন সেই ব্যক্তিই অন্যের দুঃখ মোচন করিতে সমর্থ। ঈশ্বরের অমৃত প্রেম-ভাণ্ডার হইতে যাহার সকল অভাবের পরিসমাপ্তি হইয়াছে সেই ভাগ্যবান্ পুরুষই মনুষ্যের হৃদয়াভ্যন্তরে ঈশ্বর-প্রেমের উৎস খুলিয়া দিতে পারে। সে উৎস খুলিয়া গেলে অনন্ত উৎসবের দ্বার খুলিয়া যায়। তাহার প্রবল স্রোতে দুঃখ তাপ ভয় বিভীষিকা কোথায় কোন্ পাতাল-গহ্বরে নিমগ্ন হইয়া যায। তখন আর আত্মায় আত্মায় প্রাচীরের ব্যবধান থাকে না। মনুষ্যে মনুষ্যে দেখা হইলে পরস্পরের নয়ন শরীরের বন্ধন না মানিয়া পরস্পরের আত্মার অন্তঃপুরধামে প্রবেশ করে, এবং সকল আত্মা মিলিয়া পরমাত্মার প্রেম-রসে দ্রবীভূত হইয়া আর সেখান হইতে ফিরিয়া আসিতে চাহে না। মনুষ্যের এই এক মহৎ দুঃখ যে, কেন এই স্বর্গের দ্বার পৃথিবীতে একেবারে রুদ্ধ হইয়া রহিয়াছে। মনুষ্য দুঃখের উপর দুঃখ পাইতেছে, জানিতেছে, দেখিয়া শিখিতেছে, ঠেকিয়া শিখিতেছে, তবুও কেন আবার পুনঃ পুনঃ কণ্টকময় পথে বিচরণ করে। একবারও শান্তি-ধামের দিকে ফিরিয়া চাহে না। ইহাকেই বলে মোহ, ইহাকেই বলে অবিদ্যা, ইহা-কেই বলে মায়া, ইহাই যত কিছু কু সমস্তেরই মূল। বন্য হরিণকে ক্ষুধার্ত্ত দেখিয়া কোন দয়ার্দ্র ব্যক্তি যদি

ভালবাসিয়া তাহাকে তৃণ পত্র খাওয়াইতে যায়, তবে সে হরিণ পলাইয়া যায় কেন? যদি সে ঐ ব্যক্তির প্রদত্ত ভক্ষ্য গ্রহণ করিত তাহা হইলে তাহার ক্ষুধা-নিবৃত্তি হইত এবং কত আদর পাইত। তাহা তাহার ভাগ্যে ঘটিল না, শুধু শুধু সে কেবল ভয়েই অস্থির! সেই হরিণের মধ্যে এবং সেই মনুষ্যের মধ্যে কি একটা মিথ্যা প্রাচীর দণ্ডায়মান হইল। এ প্রাচীরের কিছুই আবশ্যকতা ছিল না। এ প্রাচীরের পত্তন-ভূমি মিথ্যা একটা ভ্রম ভিন্ন আর কিছুই নহে। এইরূপ একটা অলীক ভ্রমকে প্রস্তরময় দুর্গ মনে করিয়া আমরা তাহাব সীমা লঙ্ঘন করিতে কিছুতেই সাহস পাই না। ঈশ্বরের নিকটে গেলেই আমাদের সকল অভাব দূরে যায়, যাহা আমরা চাহিতেছি তাহাই আমরা পাই, ইহা জানিয়াও আমাদের সেই সাধের দুর্গ হইতে এক পা বাহিরে যাইতে হইলে আমাদের প্রাণসংশয় উপস্থিত হয়। হরিণ মুগ্ধ জীব। সে মৃগ-তৃষ্ণায় ভুলিতে পারে, কিন্তু আমরা মনুষ্য হইয়া জ্ঞানবান জীব হইয়া মৃগতৃষ্ণিকা-নদী পার হইতে কেন যে এত ডরাই, তাহা বুঝিতে পারা যায় না। আমরা জানিতেছি যে সেই মায়া-মরীচিকার পর পারে ঈশ্বরের অতুল প্রেম-ঐশ্বর্য্য আমাদের জন্য অবারিত রহিয়াছে তথাপি আমাদের

নিজের মনঃকল্পিত সেই মায়া-নদী উল্লঙ্ঘন করিতে আমরা নিজে ভীত হই, এই এক আশ্চর্য্য বিভীষিকা। স্বপ্নের কাল্পনিক ব্যাঘ্রকে সম্মুখে দেখিয়া আমরা এত ভয় পাই যে, সেই ভয়ে আমরা বাস্তবিক প্রাণত্যাগ করি।

কত শত পর্য্যটক কত শত নদনদী পর্ব্বত মারী দুর্ভিক্ষ রাক্ষসাচারী অসভ্য লোকদিগের শত্রুতা অতিক্রম করিয়া নাইল নদীর মূল উৎস আবিষ্কার করিবার জন্য কত শত দিন অনাহারে অনিদ্রায় যাপন করিয়াছেন, বিষাক্ত মশক দংশনে জ্বর যাতনা অনুভব করিয়াছেন, পৈশাচিক আচার ব্যবহার দর্শনে অন্তর্দাহে দগ্ধ হইয়াছেন, প্রাণকে তুচ্ছ বোধ করিয়াছেন, প্রিয় আত্মীয় স্বজনের মুখ-জ্যোতি হইতে আপনাকে জন্মের মত নির্ব্বাসিত করিয়াছেন তথাপি স্বীয় অভীষ্ট সাধন হইতে এক বিন্দুও পরাঙ্মুখ হ'ন নাই। নাইল্ নদীর উৎস আবিষ্কার করিবার জন্য যদি মনুষ্য এত বিঘ্ন অতিক্রম করিতে পারে তবে আত্মার অভ্যন্তরস্থিত অমৃত-প্রেমের উৎস আবিষ্কার করিবার জন্য আমরা কি এইটুকুও পারিব না যে, মোহ-নদী যাহা মরীচিকা-মাত্র আমাদের মনের কল্পনা-মাত্র সেই নদী-উত্তরণে যত্ন-নিয়োগ করি। আমাদের নিজের ছায়াতে যদি আমরা নিজে ভীত হই, তবে আমাদের

মনুষ্য-জন্ম বৃথা ! এই মোহ-মরীচিকা আমাদিগকে কি পর্য্যন্ত না প্রতারিত করিতেছে। পরমাত্মা আমাদের আত্মাতে অধিষ্ঠান করিতেছেন অথচ মোহে আচ্ছন্ন হইয়া আমরা তাঁহাকে ভুলিয়া রহিয়াছি। তাই আমরা মনে করি যে, আমাদের প্রাণের প্রাণ আত্মার আত্মা আমাদের নিকট হইতে দূরে রহিয়াছেন। তথাপি সময়ে সময়ে যখন আমরা সংসারারণ্যের চতুর্দ্দিক অন্ধকার দেখি তখন তাঁহাকে দেখিবার জন্য আমাদের হৃদয় ব্যাকুল হইয়া উঠে। তখন আমাদের মন হইতে এইরূপ কাতর ধ্বনি উত্থিত হয় "কোথায় আমরা তাঁহারদর্শন পাইব?" আমরা দেব-মন্দিরে গেলেই দেবতার দর্শন পাই, কোথায় গেলে পরমাত্মার দর্শন-লাভ করিতে পারি তাঁহার পূজা করিতে পারি? ব্রাহ্মধর্ম্ম ইহার এই উত্তর দিতেছেন যে, "শান্তোদান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতোভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি" সাধক শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু এবং সমাহিত হইয়া আত্মাতে পরমাত্মাকে দর্শন করেন। শান্ত-দান্ত হইয়া অর্থাৎ সংযত-চিত্ত হইয়া, উপরত হইয়া অর্থাৎ বিষয়াকর্ষণ হইতে মুক্ত হইয়া, তিতিক্ষু হইয়া অর্থাৎ দুঃখসহিষ্ণু হইয়া, সমাহিত হইয়া অর্থাৎ তদ্গত-চিত্ত হইয়া, সাধক আত্মাতে পরমাত্মাকে দর্শন করেন। মনের শান্তি হইতে একাগ্রতা পর্য্যন্ত যাত্রা করিতে

হইবে ইহাই ব্রাহ্মের তীর্থযাত্রা। সেই খানে উপস্থিত হইয়া আত্মাতে পরমাত্মাকে দর্শন করিতে হইবে। আত্মাই ব্রাহ্মের দেব-মন্দির, পরমাত্মাই ব্রাহ্মের উপাস্য দেবতা।

ব্রাহ্মধর্ম্ম-পথিকের প্রথম বিরাম-স্থান শান্তি। তিনি প্রথমে মনকে শান্ত করিবেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম কাহাকে ব্রহ্মজ্ঞানের উপদেশ দিতে কহেন? না "সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়।" সম্যক্‌প্রশান্তচিত্ত শমান্বিত ব্রহ্মজিজ্ঞাসুকে ব্রাহ্মধর্ম্ম কিরূপে ঈশ্বরোপাসনা করিতে উপদেশ দেন, না, "তদেতৎ ব্রহ্মাপূর্ব্বং এতদমৃতমভয়ং শান্ত উপাসীত" সেই এই অনাদি পরব্রহ্মকে এই অমৃত-স্বরূপকে অভয়-স্বরূপকে শান্ত হইয়া উপাসনা করিবে। কি ব্রহ্মজিজ্ঞাসু কি ব্রহ্মের উপাসক শান্তি উভয়েরই পাথেয় সম্বল। পথিকের নানাবিধ পাথেয় সম্বল আবশ্যক কিন্তু তাহার মধ্যে অন্নই সর্ব্ব-প্রধান, যেহেতু তাহা না হইলেই নয়। সেইরূপ ব্রাহ্মধর্ম্মের পথ-যাত্রীর পাথেয় সম্বলের মধ্যে শান্তিই সর্ব্বাগ্রগণ্য। সঙ্গীত-সাধকের পক্ষে যেমন সা-রে-গা-মা শিক্ষা নিতান্ত আবশ্যক, সাহিত্য-সাধকের পক্ষে যেমন ব্যাকরণ-শিক্ষা নিতান্ত আবশ্যক, ধর্ম্মসাধকের পক্ষে সেইরূপ শান্তিশিক্ষা নিতান্ত আবশ্যক। শান্তি যে কি অমূল্য

বস্তু তাহা আমরা জানি না, আমাদের দেশের পূর্ব্বতন ঋষিরা তাহা জানিতেন। একটু সম্পদেই আমরা হর্ষে উৎফুল্ল হইয়া উঠি, একটু বিপদেই আমরা বিষাদে নিমগ্ন হই। এই আমরা আকাশে উড্ডীয়মান হইতেছি, ক্ষণপরে পাতালে নিমগ্ন হইয়া যাইতেছি। মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে আমাদের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয় হইতেছে। শিশু যেমন নূতন চলিতে শিক্ষা করিয়া এই চলিতেছে,এই পড়িয়া যাইতেছে,এই উঠিয়া দাঁড়াইতেছে, আবার চলিতেছে ব্রাহ্মধর্ম্ম-পথে আমরা সেই ভাবে চলিতেছি। আমরা যদি কিয়ৎ সপ্তাহ ধরিয়া শুদ্ধ কেবল মনকে প্রশান্ত করিতে সচেষ্ট হই তাহা হইলে ব্রাহ্মধর্ম্মের পথ আমাদের পক্ষে অনেক সুগম হইয়া যায়। পথ চলিবার পূর্ব্বে হাঁটিতে শেখা আবশ্যক, ধর্ম্ম-পথে চলিবার পূর্ব্বে মনকে প্রশান্ত করা আবশ্যক। শান্তির চরম আদর্শ এইরূপ, "আপূর্য্যমানমচলপ্রতিষ্ঠং সমুদ্রমাপঃ প্রবিশন্তি যদ্বৎ" আপূর্য্যমান অচল-প্রতিষ্ঠ সমুদ্রে যেমন জল-রাশি প্রবেশ করে, "তদ্বৎ কামা যং প্রবিশন্তি সর্ব্বে স শান্তিমাপ্নোতি ন কামকামী" সেইরূপ যাঁহাতে কামনা-সকল প্রবেশ করিয়া বিলীন হয়, তিনিই শান্তি লাভ করেন, যিনি কাম্য বিষয়-সকল কামনা করেন তিনি নহেন।

ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-পথিকের প্রথম বিরাম-স্থান শান্তি

দ্বিতীয় বিরাম-স্থান দান্তি অর্থাৎ ইন্দ্রিয় দমন। যখন বিষয়ের প্রলোভন সম্মুখে উপস্থিত নাই তখন আমরা নিভৃত স্থানে বসিয়া মনকে প্রশান্ত করিলাম কিন্তু তাহাতে আমরা কত দূর কৃত-কার্য্য হইলাম তাহা পরীক্ষা-ব্যতিরেকে জানা যাইতে পারে না। তখনই আমরা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইব যখন আমরা দেখিব যে, বিষয়-রাজ্যে বিচরণ করিবার সময় ইন্দ্রিয়-অশ্ব নিয়ত আমাদের বশে থাকে, একবারও আমাদের নিয়ম-রশ্মি অমান্য করে না। যে আত্মার ইঙ্গিত-মাত্রেই ইন্দ্রিয়-অশ্ব কুপথ পরিত্যাগ করিয়া সুপথে ধাবিত হয় সেই আত্মাই আত্মা। সাধক নির্জ্জন স্থানে শান্তি অভ্যাস করিবেন এবং বিষয়ের সংগ্রাম-ক্ষেত্রে দান্তি অভ্যাস করিবেন তাহা হইলে ক্রমে তাঁহার আত্মাতে অজেয় বল উদ্ভূত হইবে।

ব্রাহ্ম-ধর্ম্ম-পথিকের তৃতীয় বিরাম-স্থান উপরতি। সাধক যখন দান্তি-শিক্ষায় পরিপক্বতা লাভ করেন তখন তাঁহার মন বিষয়-বন্ধন হইতে অনেকটা নিষ্কৃতি পায়; তখন তাঁহার নিকট প্রলোভনের প্রলোভনত্ব থাকে না, বিভীষিকার ভীষণত্ব থাকে না, মোহের আকর্ষণ থাকে না; তিনি তখন সংসারে লিপ্ত থাকিয়াও নির্লিপ্ত, নিবাসে থাকিয়াও প্রবাসী, প্রবাসে

থাকিয়াও নিবাসী ; এইরূপ বিষয়ের প্রতি অনাসক্ত ভাবকেই উপরতি কহে। উপরতি কি আরামের বস্তু! উপরতিই আত্মার স্বাস্থ্য। অনেক দিন রোগ ভোগ করিয়া আরোগ্য লাভ করিলে শরীরে যেমন আরাম বোধ হয়, ক্ষুধানল প্রজ্জ্বলিত হয় চক্ষু মুখ প্রসন্ন হয়, অনেক দিনের সঞ্চিত মোহ-গরল আত্মা হইতে বিধৌত হইয়া গেলে আত্মা সেইরূপ আরাম উপভোগ করে আত্মার শ্রী ফিরিয়া যায়।

ব্রাহ্মধর্ম্ম-পথিকের চতুর্থ বিরাম-স্থান তিতিক্ষা। সাধক উপরতি-সোপানে উত্তীর্ণ হইলেও সাংসারিক উৎপাত তাহাকে আক্রমণ করিতে ছাড়ে না, সে সমস্ত সহ্য না করিলে তাঁহার আর উপায়ান্তর নাই। অনেক ধর্ম্ম-শাস্ত্র এইরূপ দেখিয়া সাধককে সংসার পরিত্যাগ পূর্ব্বক বনে পলাইতে উপদেশ দেন কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্ম এস্থলে সাধককে সহিষ্ণুতা অভ্যাস করিতে উপদেশ দেন।

ব্রাহ্মধর্ম্ম পথিকের পঞ্চম বিরাম-স্থান একাগ্রতা। ব্রাহ্ম সাধক পূর্ব্বেকার ঐ চারিটি সাধনে পরিপক্কতা-লাভ করিলে তাঁহার পথের কণ্টক সকল দূরীভূত হয়, তাহা-হইলেই তাঁহার মন নির্ব্বিঘ্নে একাগ্রতা-মঞ্চে উপনীত হয়। এইরূপ সাধন দ্বারা সাধকের মন যখন বিষয়-পাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া আত্মার দিকে

ফিরিয়া দাঁড়ায়, তখন সেই সাধক আত্মার পবিত্র দেবালয়ে পরমাত্মার দর্শন লাভ করেন, দর্শন-মাত্রে আত্মা এত দিন ধরিয়া যাহার জন্য বিষাদ-সাগরে নিমগ্ন হইয়া রোদন করিয়াছে সেই অতুল্য অমূল্য রত্ন প্রাপ্ত হয়। যং লব্ধ্বা চাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ। যাঁহাকে পাইয়া অন্য কোন লাভকেই লাভ বলিয়া মনে হয় না; ব্রাহ্মধর্ম্ম তাই বলেন

"শান্তোদান্ত উপরতস্তিতিক্ষুঃ সমাহিতোভূত্বা আত্মন্যেবাত্মানং পশ্যতি। নৈনং পাপ্মা তরতি সর্ব্বং পাপ্মানং তরতি নৈনং পাপ্মা তপতি সর্ব্বং পাপ্মানং তপতি বিপাপোবিরজোঽবিচিকিৎসোব্রাহ্মণোভবতি।

শান্ত দান্ত উপরত তিতিক্ষু এবং সমাহিত হইয়া সাধক আত্মাতে পরমাত্মাকে দর্শন করেন; পাপ ইহাঁকে অতিক্রম করিতে পারে না ইনি সমুদায় পাপকে অতিক্রম করেন; পাপ ইঁহাকে দহন করিতে পারে না ইনি সমুদয় পাপকে দহন করেন। ইনি নিষ্পাপ নির্ম্মল এবং নিঃসংশয় হইয়া ব্রাহ্মণ হ'ন। "স মোদতে মোদনীয়ং হি লব্ধ্বা" আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মকে পাইয়া তাঁহার আর আনন্দ রাখিবার স্থান থাকে না "তরতি শোকং" তিনি শোক হইতে উত্তীর্ণ হ'ন "তরতি পাপ্মানং" তিনি পাপ হইতে উত্তীর্ণ হন "গুহাগ্রন্থিভ্যোবিমুক্তোঽমৃতোভবতি" সমস্ত হৃদয়-গ্রন্থি হইতে বিমুক্ত হইয়া অমৃত হ'ন।

হে পরমাত্মন্, আমাদের আত্মাকে তুমিই তোমার দেবালয়রূপে প্রস্তুত করিয়াছ; যাহাতে সেই স্থানে গিয়া তোমার দর্শন লাভ করিতে পারি ও তোমার পূজা করিয়া জীবন সার্থক করিতে পারি আমাদের সকলকে সেই পথ প্রদর্শন কর; কত-দিন আমরা তোমা হইতে, অমৃতের প্রস্রবণ হইতে, দূরে দূরে পরিভ্রমণ করিয়া সংসার-দাবানলে দগ্ধ হইতে থাকিব; তুমি তোমার প্রেমামৃত বর্ষণ কর যে, আমাদের শুষ্ক হৃদয় বিকসিত হইবে আমাদের মলিন মুখ উজ্জ্বল হইবে আমাদের সকল দুঃখ অবসান হইবে; তোমার প্রেমমুখ আমাদের নিকট প্রকাশিত কর এই আমাদের প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

সপ্তম উপদেশ।

৫৫ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৭ পৌষ।

পরব্রহ্মকে লাভ করা এবং পরব্রহ্মের জ্ঞান লাভ করা এ দুয়ের মধ্যে কিঞ্চিৎ ইতর-বিশেষ আছে। আমাদের জ্ঞানে ইহা স্পষ্টরূপে প্রতীয়মান হইতে পারে যে, সকল জগতের অভ্যন্তরে এবং প্রতিজনের

অভ্যন্তরে পরমাত্মা বর্ত্তমান আছেন, তিনি জ্ঞানময় আনন্দময় এবং মঙ্গলময়, কিন্তু তাহা হইলেই কিছু-আর পরব্রহ্মকে লাভ করা হয় না। আত্মা যখন সমুদায় প্রীতির সহিত পরমাত্মাতে নিবিষ্ট হয় তখনই সে পরমাত্মাকে লাভ করে। আত্মা যখন পরমাত্মাকে অবলম্বন করিয়া জ্ঞানের অনুশীলন করে, শুভ কার্য্যের অনুষ্ঠান করে, এবং আনন্দের আস্বাদন করে, তখনই পরমাত্মা আত্মাতে সুস্পষ্ট বিরাজ করেন, তখনই বলা যাইতে পারে যে সাধক পরব্রহ্মকে লাভ করিয়াছেন। যদি কোন শুভ মুহূর্ত্তে ক্ষণকালের জন্যও পরমাত্মার সহিত আত্মার সাক্ষাৎকার হয়, তবে তাহা সাধকের পরম লাভ। কিন্তু যিনি পরমাত্মাকে সমুদায় আত্মা সমর্পণ করিয়া অনন্ত কালের অনন্ত জীবনের মত তাঁহাকে আত্মাতে প্রাপ্ত হইয়াছেন ইহ-জীবনেই তিনি অন্ধকারের পরপারে জ্যোতির্ম্ময় ধামে উপনীত হইয়াছেন তিনিই ধন্য। আত্মার এই চরম ফল লাভ করিতে হইলে কিরূপে আত্মাকে প্রস্তুত করিতে হইবে তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মে কথিত হইয়াছে জ্ঞান-উপার্জ্জন করিতে হইবে—কিন্তু কেবল জ্ঞানে কিছুই হইবে না, সর্ব্বাগ্রে এইটি আবশ্যক যে দুশ্চরিত হইতে বিরত হইতে হইবে শান্ত সমাহিত হইতে হইবে মনস্কামনা শান্ত করিতে হইবে।

জ্ঞান লাভ করিতে হইলে লোকে যেমন শান্ত সমাহিত হইয়া গুরুর নিকটে গমন করেন এবং গুরুর শরণাপন্ন হ'ন ঈশ্বরকে লাভ করিতে হইলে সেইরূপ শান্ত-সমাহিত হইয়া ঈশ্বরের নিকট গমন করা এবং তাঁহার শরণাপন্ন হওয়া সাধকের প্রথম কর্ত্তব্য কেন না, তাঁহার জ্ঞান এবং তাঁহার সাধন যেমন আমরা তাঁহার নিকট হইতে শিক্ষা করিতে পারি এমন আর কাহারো নিকট হইতে নহে।

যে-টুকু ঈশ্বর-জ্ঞান সকলেরই থাকা আবশ্যক সে-টুকু ঈশ্বর-জ্ঞান সকল ব্যক্তিরই আছে, সাধক সেই-টুকু অবলম্বন করিয়া ঈশ্বরের নিকটে গমন করিবেন, এবং তাঁহাকে আপনার পরম গুরু জানিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হইবেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন যে, ব্রহ্মজ্ঞানরূপ স্বর্গীয় অগ্নি সকলেরই হৃদয়ে বর্ত্তমান আছে। কিন্তু সকলেরই হৃদয়ে তাহা যে সমান মাত্রায় বর্ত্তমান আছে তাহা নহে। ভিন্ন ভিন্ন আধারে তাহা ভিন্ন ভিন্ন মাত্রায় বর্ত্তমান আছে; যে ব্যক্তিতে যে মাত্রায় বর্ত্তমান আছে, সে ব্যক্তির তাহাই প্রথম পক্ষে অবলম্বনীয়।

এমন কত শুনা গিয়াছে যে, জ্ঞান-শিক্ষার্থী শিষ্য কত বৎসর ধরিয়া এক মনে গুরুর সেবা শুশ্রূষায় জীবন অর্দ্ধাবসান করিলে তবে গুরু তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হইয়া তাঁহাকে বিদ্যা দান করিয়াছেন; আমা-

দের দেশের এই যে পূর্ব্বতন প্রথা, অগ্রে আত্ম-সংযম-শিক্ষা পরে জ্ঞান-শিক্ষা, ইহার অর্থ অতি গভীর। বুদ্ধি-বৃত্তি আত্মার একটি অঙ্গ-বিশেষ, মনে কর তাহা আত্মার চক্ষু। শুদ্ধ কেবল বুদ্ধির চালনা করিলে আত্মার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হইতে পারে এই পর্য্যন্ত, কিন্তু আত্মসংযম সমুদায় আত্মার ব্যায়াম স্বরূপ; শরীরের সর্ব্বাঙ্গীণ ব্যায়াম যেমন শরীরের পক্ষে মহোপকারী, সেইরূপ আত্ম-সংযম আত্মার পক্ষে মহোপকারী; কিন্তু যদি শরীরের কেবল একাঙ্গেরই বল সাধন করা যায় তবে অবশিষ্ট অঙ্গ-সমূহের বল অপহরণ করিয়া সেই একটি অঙ্গেরই পুষ্টি-সাধনে তাহাকে নিযুক্ত করা হয় ইহাতে শরীরের প্রভূত অনিষ্ট-সাধন করা হয়; সেইরূপ যদি কেবল-মাত্র বুদ্ধি-বৃত্তিকেই অতি-রিক্ত-মাত্রায় পরিপুষ্ট করা যায়, তবে আত্মার অন্যান্য বৃত্তি ক্রমশ ক্ষীণ-বল হইয়া পড়ে; এই কারণ-বশত আমাদের দেশে আত্ম-সংযমের দৃঢ় ভিত্তি-ভূমির উপ-রেই বিদ্যাশিক্ষার মূলপত্তন শ্রেয় বলিয়া পরিগণিত হইত।

প্রথমতঃ আত্মসংযম যাঁহার অভ্যস্ত হইয়াছে তাঁহার অন্তঃকরণ-ক্ষেত্রে জ্ঞানবীজ যেমন সুচারুরূপে অঙ্কুরিত এবং ফলিত হইতে পারে, অসংযত চিত্তে কখনই সেরূপ সম্ভবে না; অসংযত চিত্তে জ্ঞান-বৃক্ষ

রোপিত হইলে, তাহাতে কণ্টকের ভাগই অধিক পরিমাণে ফলিত হয়, ফল পুষ্পের তেমন শ্রী সৌন্দর্য্য খুলিতে পায় না। অসংযতচিত্ত ব্যক্তিকে ব্রহ্ম-বিদ্যা প্রদান করিলে, তাহা হইতে ক্রমশই কুতর্ক, সংশয়, প্রভৃতি তীক্ষ্ণ কণ্টক-সকল বিকীর্ণ হইতে থাকে; প্রেম, ভক্তি, শান্তি, প্রসন্নতা, আত্ম-জ্যোতি, ব্রহ্মানন্দ, এ সকল ফল-ফুলের কোন চিহ্নই তাহাতে পরিস্ফুট হয় না। কিন্তু কে বিদ্যার উপযুক্ত পাত্র কে-ই বা অনুপযুক্ত পাত্র ইহা স্থির করিয়া উঠা মনুষ্য-গুরুর পক্ষে অতীব দুষ্কর। কাহার অন্তঃকরণ কিরূপ এবং কিমাত্রা বিদ্যা-লাভের উপযুক্ত তাহা জানিতে পারা সহজ ব্যাপার নহে। স্বয়ং ঈশ্বরই তাহা জানেন। ঈশ্বর স্বয়ং গুরু হইয়া যাঁহাকে যে-কোন জ্ঞান প্রদান করেন তাঁহাকে তাঁহার উপযুক্ত পাত্র জানিয়াই প্রদান করেন; সুতরাং স্বয়ং ঈশ্বরের নিকট হইতে যিনি যে টুকু ব্রহ্ম-জ্ঞান প্রাপ্ত হইয়াছেন তিনিই তাহার উপযুক্ত পাত্র। জ্ঞানই হোক্ আর যে কোন বিষয়ই হো'ক্ ঈশ্বরের নিকট আমরা যখন যাহা কিছু প্রার্থনা করি, তাহার ফল ঈশ্বর আমাদিগকে যাহা-কিছু প্রদান করেন তাহারই আমরা উপযুক্ত, এইটি যেন আমাদের মনে থাকে; তাহা হইলেই ঈশ্বরের নিকট প্রসাদ প্রার্থনা করিয়াই আমরা ক্ষান্ত থাকিব না। এক দিকে যেমন

আমরা তাঁহার প্রসাদ প্রার্থনা করিব, আর একদিকে তেমনি তাঁহার প্রসাদলাভের উপযুক্ত হইবার জন্য সর্ব্বদা সচেষ্ট থাকিব।

পিতা যেমন পুত্রের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী পরমাত্মা সেই-রূপ আত্মার মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী। এই জন্য পরমাত্মার নিকট গমন করিতে হইলে আত্মাকে তাঁহার সাক্ষাৎ-কারের জন্য প্রস্তুত করা আবশ্যক। আমাদের সাধ্যানুসারে আমরা আত্মাকে স্বচ্ছ নির্ম্মল ও উজ্জ্বল করিতে চেষ্টা করিব আমাদের যাহা সাধ্যাতীত ঈশ্বর স্বয়ং তাহা পূরণ করিবেন; মাতা কিছু আর বালকের মলিন মুখ মুছাইয়া দিতে কুণ্ঠিত হ'ন না, ঈশ্বর কি তাঁহার অনুরক্ত ভক্তের পাপ-মলিনতা মুছা-ইয়া দিতে কুণ্ঠিত হইবেন—কখনই না। আমরা যদি কেবল কপটতা, ছদ্ম-বেশিতা ও প্রগল্‌ভতার আবরণ দূরে নিক্ষেপ করিয়া সরল ভাবে তাঁহার নিকট গমন করি, তবে তিনি স্বীয় প্রসাদ-বারি দ্বারা কৃপা-বারি-দ্বারা আমাদের সমস্ত মলিনতা প্রক্ষালন করিয়া দেন; কিন্তু আমরা আমাদের সেই পুত্র-বৎসল পিতার নিকট ভক্তবৎসল গুরুর নিকট দীন-বৎসল প্রভুর নিকট প্রাণবল্লভ বন্ধুর নিকট গমন করি না, আমরা আপনারাই আত্মার দ্বার রুদ্ধ করিয়া মনে করি যে ঈশ্বর আমাদের প্রতি

তাঁহার শান্তিনিকেতনের দ্বার রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন।

আমরা আপনারা ভগবৎ-নিকেতনের প্রবেশ-দ্বার রুদ্ধ করিয়াছি, সে দ্বার উদ্ঘাটন করা আমাদের আপনাদেরই কার্য্য। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, আমরা আপনারাই ঈশ্বরকে চাহি না ঐশ্বর্য্যকে চাই, ইহাতেই ঈশ্বর-নিকেতনের প্রবেশ দ্বার রুদ্ধ হইয়া যায়; কিন্তু যদি আমরা তদ্গত প্রাণে ঈশ্বরকে প্রার্থনা করি তবে সেই দ্বার পুনর্ব্বার উদ্ঘাটিত হইয়া যায়। নির্ম্মল সরল অন্তঃকরণে ঈশ্বরকে প্রার্থনা করাই ভগবৎমন্দিরের দ্বার উদ্ঘাটন করা। আমরা যখন তাঁহাকে প্রার্থনা করিব তখন তাহার মধ্যে যেন কোন প্রকার পার্থিব অভিসন্ধি লুক্কায়িত না থাকে। যাহা আমাদের প্রয়োজন তাহা তিনি আমাদিগকে দিবেনই তাহার জন্য আমাদিগকে ভাবিতে হইবে না, প্রত্যুত আমরা যখন তাঁহাকে প্রার্থনা করি তখন যেন তাঁহাকেই আমরা প্রার্থনা করি, আর কোন দিকে দৃষ্টিপাত না করি। যিনি দুশ্চরিত্র হইতে বিরত হইয়া শান্ত-সমাহিত চিত্তে একান্ত মানসে তাঁহাকে প্রার্থনা করেন তাঁহার সে প্রার্থনা কখনই বিফল হয় না; ঈশ্বর তাঁহাকে অচিরাৎ দর্শন দেন তখন তাঁহার প্রার্থনা হৃদয়ের প্রেমোচ্ছ্বাসে

পরিণত হয় এবং অশ্রুধারা আনন্দধারায় পরিণত হয়।

হে পরমাত্মন্! তোমার প্রসাদ-বারির প্রত্যাশায় আমরা সবান্ধবে অদ্য এখানে সমাগত হইয়াছি আমরা যেন শূন্য হৃদয়ে ফিরিয়া না যাই। তোমার করুণা মাতৃস্তনে দুগ্ধ ভারতবর্ষে ভাগীরথী ভক্ত হৃদয়ে শান্তি-বারি! তোমার করুণা-বারিতে অবগাহন করিয়া পাপ তাপ হইতে মুক্ত হইব, এবং নিষ্পাপ নির্ম্মল চিত্তে তোমার চরণে প্রীতি-পুষ্প প্রদান করিয়া জীবনকে সার্থক করিব, এই অভিপ্রায়ে আমরা এখানে সম্মিলিত হইয়াছি তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হইয়া আমাদের মনস্কামনা পূর্ণ কর।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

অষ্টম উপদেশ।

৫৫ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৬ মাঘ রবিবার।

ঈশ্বর অনন্ত ও মহান, আর আমরা ক্ষুদ্র ও পরিমিত, তথাচ তাঁহাকে জানিতে আমাদের অন্তরের পিপাসা। আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞান সেই অগাধ অতলস্পর্শ গভীর সমুদ্রে নিমগ্ন হয়, কিন্তু খানিকটা গিয়া

দিক্‌ভ্রষ্ট পথিকের ন্যায় সচকিতে ফিরিয়া আইসে; তথাচ তাঁহাকে জানিতে আমাদের অন্তরের পিপাসা। কিন্তু আমরা দেখিতেছি আমাদের পাঁচটী মাত্র জ্ঞান-লাভের দ্বার। তদ্দ্বারা আমরা রূপরসাদিরই জ্ঞান লাভ করিতে পারি। আবার দেখিতেছি, যে ভূতে যতগুলি ভৌতিক গুণ কম সেই ভূতই অপেক্ষাকৃত ব্যাপক। পৃথিবীতে রূপাদি পাঁচটী গুণ আছে কিন্তু জলে গন্ধগুণ নাই, এজন্য জল পৃথিবী অপেক্ষা ব্যাপক। তেজে গন্ধ ও রস নাই এজন্য তাহা পৃথিবী ও জল অপেক্ষা ব্যাপক। বায়ুতে গন্ধ রস ও রূপ নাই এজন্য তাহা পৃথিবী জল ও তেজ অপেক্ষা ব্যাপক। আকাশে কেবল শব্দ মাত্র আছে অথবা তাহাতে কোনও রূপ জড়ধর্ম্ম নাই এজন্য তাহা সমস্ত ভূত অপেক্ষা ব্যাপক। কিন্তু এই অনন্ত আকাশ যাঁহার উদর সেই অশব্দ অস্পর্শ অরূপের ব্যাপকতার সীমা কোথায়। তিনি কিছুতেই আমাদের ইন্দ্রিয়ের প্রত্যক্ষ হইতে পারেন না। তিনি যদিও ইন্দ্রিয়ের অগ্রাহ্য কিন্তু আত্মার গ্রাহ্য। এই আত্মার গ্রাহ্য বলিয়া কি আমরা সেই অগাধ গম্ভীর সমুদ্রের তলস্পর্শ করিতে পারি? কখনই না।

ঈশ্বর আত্মার গ্রাহ্য, কিন্তু আত্মা নির্ম্মল ও স্থির না হইলে আমরা তন্মধ্যে ঈশ্বরকে দেখিতে পাই না।

নির্ম্মল ও স্থির জলেই চন্দ্রবিম্ব সুস্পষ্ট দেখা যায়। কিন্তু আত্মাকে নির্ম্মল ও স্থির করা অতি কঠিন ব্যাপার। ইহাতে কঠোর তপঃসাধন চাই। আত্মার মধ্যে নিরন্তর দেবাসুরের দ্বন্দ্ব চলিতেছে। অসুরগণ বলমদে উন্মত্ত ও দুর্ণিবার। উহাদের মধ্যে যুদ্ধে যদি একটীরও জয় হয় তবে সকলেই সিংহবিক্রমে উত্থান করে। দেবতারা যদিও সমরপটু কিন্তু অসুরেরা বড় প্রবলপ্রতাপ। এই দেবাসুরের যুদ্ধে দেবগণের জয়-সাধনই তপঃসাধন। কিন্তু তাহা অনন্তদেশব্যাপী অনন্তদেবের প্রসাদ ভিন্ন সিদ্ধ হয় না। এই সাধনের বলে আত্মায় রজস্তমের অভিভব ও সত্ত্বের উদ্রেক হইবে। রজস্তমের সততই বহির্মুখপ্রবৃত্তি। ইহাতে আত্মা অস্থির হয়। কিন্তু সত্ত্বের সততই অন্তর্মুখ-প্রবৃত্তি। ইহাতে আত্মা স্থির হয়। এইরূপ সত্ত্বের উদ্রেকে আত্মার স্থিরতা সম্পাদন করিতে পারিলে তবেই ঈশ্বর তাহার গ্রাহ্য হইবেন।

কিন্তু আত্মা স্থির হইলে মনে করিও না সেই পূর্ণস্বরূপকে সম্পূর্ণ রূপে গ্রহণ করিতে পারিবে। অজ্ঞান শিশু পূর্ণকল চন্দ্রমণ্ডল ধরিবার জন্য কর-প্রসারণ করে। সে দেখিতেছে ঐ তো চন্দ্র, কেন ধরিতে পারিব না, কিন্তু চন্দ্রমণ্ডল তার বহু দূরে। সে ধরিতে পারিল না বটে কিন্তু হতাশ

হয় না, সে স্বচক্ষে সুস্পষ্ট চন্দ্রকে দেখিতে পায়, চন্দ্রকিরণে উৎফুল্ল হয় এবং আবার ধরিবার চেষ্টা করে। আমাদের অবস্থাও ঠিক এইরূপ। আমরা আত্মার চক্ষে ঈশ্বরকে দেখিতে পাইতেছি, তাঁহার সৌন্দর্য্যচ্ছটায় মোহিত ও বিমল জ্যোৎস্নায় উৎফুল্ল হইতেছি এবং তাঁহাকে ধরিবার জন্য শিশুর ন্যায় ক্ষুদ্র হস্ত পুনঃ পুনঃ প্রসারণ করিতেছি কিন্তু তাঁহাকে ধরিতে পারিতেছি না, তিনি আমাদের বহু দূরে। কিন্তু ইহাতেও আমরা হতাশ হইতেছি না। আমরা দেখিতেছি তিনি আমাদের অন্তরের অন্তর, আমরা কেন তাঁকে ধরিতে পারিব না, উৎসাহের সহিত আবার হাত বাড়াইতেছি কিন্তু তিনি দূরাৎ সুদূরে। সম্ভবত আমাদের এইরূপ অবস্থাই স্থায়ী। আমরা শিশুর ন্যায় চির দিনই করপ্রসারণ করিব কিন্তু তাঁহাকে ধরিতে পারিব না। আমাদের ক্ষুদ্র জ্ঞানের অনন্ত কাল ধরিয়া এত প্রসার হইবে না যে আমরা সম্পূর্ণরূপে সেই মহতো মহীয়ানকে ইহার আয়ত্ত করিতে পারিব। শিশু যত বাড়িবে চন্দ্র তার তত দূরে। আমরা যত বাড়িব ঈশ্বরও আমাদের তত দূরে। সেই পূর্ণকল চন্দ্র আমাদের নেত্রচকোর পরিতৃপ্ত করিয়া চির দিনই সম্মুখে উদিত থাকিবেন, কিন্তু তিনি সম্পূর্ণরূপে কখনই আমাদের আয়ত্ত হইবেন না।

বুদ্ধি তাঁহার নিকট পরাস্ত কিন্তু হৃদয় পরাস্ত হয় না। সে তাঁহাকে পাইয়াছে। সে আপনার উপর সেই রাজগণরাজের স্বর্ণসিংহাসন প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। বুদ্ধির অতৃপ্তি কিন্তু হৃদয়ের অতৃপ্তি নাই। সুরনদী মন্দাকিনী স্বর্গ মর্ত্ত্য পাতাল ভেদ করিয়া অনন্ত স্রোতে অনন্ত পথে চলিয়াছে। ইহার আদি কোথায় অন্তই বা কোথায় কিছুই নির্ণয় হইবার নয়। হৃদয় সেই স্রোতে ভাসিয়াছে এবং তাহার অমৃত বারি পান করিয়া শীতল হইতেছে, এই তাহার তৃপ্তি। বুদ্ধি! নির্ব্বোধ বুদ্ধি! যাহা পৃথিবীর ক্ষুদ্রাৎ ক্ষুদ্রতর একটী বিন্দুকে অধিকার করিয়া আছে তুমি সেই সামান্য রেণুকে জানিতে পার না, কিন্তু 'যস্য ভূমিঃ প্রমা' পৃথিবীর যাঁর পদ, 'অন্তরীক্ষমুতোদরং' আকাশ যাঁর উদর, 'দিবং যশ্চক্রে মুর্দ্ধানং' দ্যুলোক যাঁর মস্তক, 'সূর্য্যশ্চক্ষুশ্চন্দ্রমাশ্চক্ষুঃ' চন্দ্র সূর্য্য যাঁর চক্ষু, বেদ এইরূপ বিরাট রূপে যাঁহাকে দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়াছে তুমি সেই সর্ব্বব্যাপী জ্ঞানময় অসীম সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে জানিতে চাও? কি ভ্রম! কি সাহস!

হৃদয়েই ঈশ্বরের পূর্ণ প্রতিষ্ঠা, এই ক্ষুদ্রে সেই অনন্তভাব উপস্থিত। আমরা পৃথিবীর নির্য্যাতনে বারংবার উৎপীড়িত, রোগে কাতর, শোকে আকুল,

আমাদের চতুর্দ্দিকে ঘন বিষাদের অন্ধকার; সম্মুখে সমস্তই চঞ্চল ও অস্থির পদার্থ, আমরা সুখের প্রত্যাশায় পদে পদেই প্রতারিত হই, আমাদের এত যে কষ্ট, এত যে ক্লেশ, ইহার মধ্যে এক মাত্র শান্তিস্থল ঈশ্বর। তিনি এই হৃদয়রূপ নিভৃত স্থানে সাক্ষীস্বরূপ থাকিয়া আমাদের সুখ দুঃখ সমস্তই প্রত্যক্ষ করিতেছেন। আমরা ভ্রমচক্রে দিক্‌ভ্রষ্ট হইলে তাঁহার ঘন ঘন আহ্বান-ধ্বনি শুনিতে পাই। পাপের বৃশ্চিক-জ্বালায় অস্থির হইলে তিনি সান্ত্বনা করেন। হৃদয়ের সমস্ত গূঢ় বেদনা জানাইলে তিনি তাহা শুনেন। ভক্তির সহিত প্রীতি-পুষ্প অর্পণ করিলে তিনি স্বহস্তে গ্রহণ করেন এবং অশব্দ বাক্যে আমাদের সহিত আলাপ করেন।

আমাদের এই যে হৃদয়-ব্যাপার ইহার অনুসরণেই বুদ্ধির তৃপ্তি। বুদ্ধি ও হৃদয় ইহার অন্যতরের অভাবে হয় অমানিশার অন্ধকার নয় মরুভূমির শুষ্কতা। বাহ্য জগতে প্রকৃতি পুরুষ, অন্তর্জগতেও প্রকৃতি পুরুষ। ইহার একটীর অভাবে সৃষ্টি-বিলোপই সম্ভব। যিনি অপক্ষপাতে এই উভয়কে রক্ষা করেন ধর্ম্ম-জগতে তাঁরই পদ অটল।

জগদীশ্বর! আমরা যদিও দিশাহারা কিন্তু তুমি আমাদের ধ্রুবতারা। তুমি স্বরূপত কি তাহা না

বুঝি কিন্তু তুমি কোটি সূর্য্যপ্রকাশে আমাদের অন্তরে বিরাজিত আছ। যখন তোমার প্রতি চাহিয়া দেখি তখন চক্ষু তোমার জ্যোতি সহিতে পারে না কিন্তু হৃদয় শীতল হয়। নাথ! আমরা তোমার দীন হীন মলিন সন্তান, তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ কর নাই, আমরাও যেন তোমাকে পরিত্যাগ না করি।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

নবম উপদেশ।

৫৫ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৫ ফাল্গুন রবিবার।

সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্ম যো বেদ নিহিতং গুহায়াং পরমে ব্যোমন্ সোহশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা। যিনি আপনার আত্মার অন্তরতম নিকেতনে, পরম ব্যোমে, সত্য-স্বরূপ জ্ঞান-স্বরূপ অনন্ত-স্বরূপ পরব্রহ্মকে নিহিত জানেন তিনি সেই সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের সহিত কামনার সমুদায় বিষয় উপভোগ করেন। আমরা যেমন ইন্দ্রিয় দ্বারা বাহ্য বস্তু সকল প্রত্যক্ষ করি, সেইরূপ আমরা একনিষ্ঠ সংশয়রহিত বুদ্ধি দ্বারা পরব্রহ্মকে আত্মাতে উপলব্ধি করি। কোন কোন বস্তুকে আমরা পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারাই উপলব্ধি

করিতে পারি ; এরূপ বস্তুকে যখন আমরা এক ইন্দ্রিয়-দ্বারা উপলব্ধি করি, তখন আমাদের মনে এইরূপ বিশ্বাস জন্মে যে, আর এক ইন্দ্রিয়-দ্বারাও আমরা তাহাকে উপলব্ধি করিতে পারি। তাহার বাস্তবিক সত্তা বিষয়ে আমাদের যদি কোন প্রকার সংশয় উপস্থিত হয়, তবে একাধিক ইন্দ্রিয়ের সাক্ষ্য গ্রহণ করিয়া তাহার সত্যাসত্য নির্ণয় করি। আর, যদি কোন বস্তু কেবল একটি মাত্র ইন্দ্রিয়ের গম্য হয়, তবে বিভিন্ন অবস্থায় সেই ইন্দ্রিয় কর্তৃক একই বিষয়ের সাক্ষ্য-প্রদানকেই আমরা তাহার সত্যাসত্যের প্রমাণ বলিয়া অবধারণ করি। আমরা যদি স্বল্প অন্ধকারে প্রাচীরের মত বা কবাটের মত কোন একটা দৃশ্য অবলোকন করি, তবে হস্ত দ্বারা স্পর্শ করিয়া তাহার সত্যাসত্য অবধারণ করি ; আর যদি দূর হইতে হস্তীর মত একটা জন্তু দেখি, তবে তাহার নিকটে অগ্রসর হইয়া তাহার মূল-গত সত্য-বৃত্তান্ত অবগত হই। এইরূপ দেখা যাইতেছে যে, বহির্ব্বস্তুর সত্তা যদি এক ইন্দ্রিয় দ্বারা স্পষ্ট বোধগম্য না হয়, তবে আর এক ইন্দ্রিয় দ্বারা আমরা তাহার তথ্য নির্ণয় করি। যদি কোন ইন্দ্রিয়ের এক অবস্থায় আমরা সম্মুখস্থিত বিষয়ের প্রতি সংশয়ান্বিত হই, তবে তাহার আর এক অবস্থায় আমরা প্রকৃত বৃত্তান্ত অবগত হই। বহির্ব্বিষয়ের

সত্যাসত্য নির্ণয় এইরূপ প্রণালীতেই হইয়া থাকে, কিন্তু আধ্যাত্মিক ও পারমার্থিক বিষয়ের সত্যাসত্য নির্ণয় ওরূপ করিয়া সম্ভবে না। ইন্দ্রিয় অনেক কিন্তু আত্মা একমাত্র; ইন্দ্রিয়-পরিচালনের বিস্তর প্রকার-ভেদ আছে, আত্ম-সমাধানের একই ভাব। সেই এক-মাত্র আত্মার একমাত্র প্রকরণ দ্বারা আমরা সত্যং জ্ঞানমনন্তং ব্রহ্মকে নিঃসংশয়রূপে অন্তঃকরণে উপ-লব্ধি করি; এই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে "একাত্মপ্রত্যয়সারং" পরব্রহ্মকে উপলব্ধি করিবার নিমিত্ত এক আত্ম-প্রত্যয়ই কেবল সার। আত্ম-প্রত্য-য়ের স্থান যদি সংশয় দ্বারা অধিকৃত হয়, তবে তাহা অতি ভয়ানক, তবে সত্যের দ্বার অবরুদ্ধ হইয়া যায়। এক ইন্দ্রিয়ের সংশয় আর এক ইন্দ্রিয় দ্বারা দূরীকৃত হইতে পারে, মনের এক অবস্থায় সংশয় আর এক অবস্থায় দূরীকৃত হইতে পারে, কিন্তু সকল মানসিক অবস্থার মূলস্থিত যে এক আত্মা তাহার সংশয় সে আপনি না নিবারণ করিলে আর কেহই তাহা নিবারণ করিতে পারে না। মনুষ্য-শরীরে দুই আত্মা নাই যে, এক আত্মার সংশয় আর এক আত্মা নিবারণ করিবে, আত্মা কোন দুই বৃত্তির মধ্যেকার এক বৃত্তি নহে যে, অন্যতর বৃত্তি দ্বারা তাহার সংশয় নিবারিত হইবে, প্রকৃত পক্ষে বিশুদ্ধ আত্মার অভ্যন্তরে সংশয়ের

স্থান নাই, আলোকের অভ্যন্তরে অন্ধকারের স্থান নাই ; সেখানে কেবলি প্রত্যয় কেবলই আলোক ; সে আলোককে কোথা হইতেও যাচিয়া আনিতে হয় না, সে আলোক আত্মা নিজেই। আত্ম-প্রত্যয় যাহা বলে তাহা যদি আমাদের পাপাসক্ত মনের সহস্রও প্রতিকূল হয়, তথাপি সম্পূর্ণ শ্রদ্ধা-ভক্তির সহিত একান্ত বিশ্বাসের সহিত তদ্‌গত চিত্তে আমরা যেন তাহা শ্রবণ-মনন করি "একাত্মপ্রত্যয়সারং" এই বাক্যটি যেন আমরা হৃদয়ে গাঁথিয়া রাখি। পরিপূর্ণ জ্ঞানালোকে আলোকিত সেই যে সকল সত্যের মূল সত্য পরব্রহ্ম যেখানে জ্ঞান যিনি তিনিই সত্য এবং সত্য যিনি তিনিই জ্ঞান সেই অনন্ত পরব্রহ্ম শুদ্ধ কেবল আত্মপ্রত্যয়ের গম্য, শ্রদ্ধা ভক্তি পরিপূর্ণ এক-নিষ্ঠ নিষ্পাপ নির্ম্মল আত্ম-প্রত্যয়ের গম্য, মনোবুদ্ধির গম্য নহেন।

এই যে অমূল্য আত্ম-প্রত্যয় এই যে আমাদের তৃতীয় চক্ষু ইহাতে শেল বিদ্ধ করিও না, ইহাকে প্রস্ফু-টিত কর ; তাহা হইলে যেমন স্পষ্টরূপে এই সমা-জের বেদী দেখিতেছ, তেমনি স্পষ্টরূপে আত্মা দেখিতে পাইবে,—এবং আত্মা ভেদ করিয়া পরমা-ত্মাকে দেদীপ্যমান দেখিবে, "দগ্ধেন্ধনমিবানলং" যেমন ইন্ধনকে দগ্ধ করিয়া অগ্নি উদ্ভাসিত হইয়া উঠে,

সেইরূপ পরব্রহ্ম আত্মার পাপ-মলিনতা দগ্ধ করিয়া সাধকের আত্ম-প্রত্যয়ে নিঃসংশয়রূপে আপনাকে প্রকাশ করেন—সত্যের মুখ অপাবৃত করিয়া দেন। তখন সাধক দেখিতে পান "আনন্দরূপমমৃতং যদ্বিভাতি" ও তাঁহার অন্তঃকরণ বলিয়া উঠে "এযে আমি তোমার আনন্দরূপ অমৃতরূপ দেখিতেছি, দেবতারা যাহা নিয়ত দর্শন করেন সেইরূপ এখন দর্শন করিতেছি, এ কি সৌভাগ্য আমার আজ উদিত হইল। গভীর সত্য.যাঁহাকে আমি অন্ধকারে আচ্ছন্ন মনে করিয়া ভীত হইয়াছিলাম, তাঁহাকে জ্ঞানের জ্যোতিতে প্রভাসিত দেখিতেছি, জ্ঞানের জ্যোতি যাহাকে নীরস মনে করিয়াছিলাম, তাহাকে অমৃত আনন্দে ভাসমান দেখিতেছি; আমি মুক্তির ইচ্ছুক হইয়া তোমার শরণাপন্ন হইতেছি। আমাকে বিশ্বাসের বল দেও যে তোমাকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া রাখিতে পারি, প্রেমের বল দেও যে তোমাকে আপনার করিয়া রাখিতে পারি, নিষ্ঠার বল দেও যে, তোমার কার্য্যে প্রাণ মন সমর্পণ করিতে পারি।" শান্তংশিবমদ্বৈতং" এই বচনটি ব্রাহ্মধর্ম্ম পথিকের আশ্রয়-যষ্টি। পরব্রহ্ম শান্ত, তিনি আজ একরূপ কাল একরূপ নহেন, তাঁহাকে অবলম্বন করিলে এ বলিয়া ভবিষ্যতে অনুতাপ করিতে হয় না যে, "আমি মনে করিয়াছিলাম

অটল ভিত্তিমূলের উপর গৃহ-প্রতিষ্ঠা করিয়াছি এখন দেখিতেছি তাহা বালির বাঁধ।” তিনি মঙ্গল-স্বরূপ, তাঁহাকে অবলম্বন করিলে ভবিষ্যতে এরূপ অনুতাপ করিতে হয় না যে “আমি তাঁহাকে আমার পরম হিতৈষী জানিয়া তাঁহার উপর অটল বিশ্বাস স্থাপন করিয়াছিলাম এখন দেখিতেছি তিনি আমার পরম শত্রু।” তিনি অদ্বিতীয়, তাঁহাকে অবলম্বন করিলে ভবিষ্যতে এরূপ অনুতাপ করিতে হয় না যে, “যত দিন তাঁহার রাজত্ব ছিল তত দিন আমাদের সুখের সীমা ছিল না, এখন আমাদের সে রাজাও নাই সে সুখও নাই” অতএব “শান্তং শিবমদ্বৈতং” বলিয়া পরমাত্মাকে আমরা যেমন অকুণ্ঠিত চিত্তে, অসংকোচে নিরাতঙ্কে অবলম্বন করিতে পারি, এরূপ কোন পুত্র পিতাকে পারে না, প্রজা রাজাকে পারে না, বন্ধু বন্ধুকে পারে না, শিষ্য গুরুকে পারে না; তিনি আমাদের সাক্ষাৎ অভয় স্বরূপ, সাক্ষাৎ মুক্তি-দাতা; আমরা যদি আন্তরিক শ্রদ্ধা ভক্তি বিশ্বাস ও প্রেম সহকারে তাঁহার নিকট গমন করি—তাহা হইলে তিনি আমাদের সমস্ত ভয় তাপ দূর করিয়া দেন, সমস্ত বন্ধন মুক্ত করিয়া দে’ন, এরূপ আশ্রয়দাতাকে যদি আমরা ভুলিয়া থাকি তবে আমাদের মনুষ্য জন্ম কিসের জন্য।

হে পরমাত্মন্! তুমি আমাদের আত্মচক্ষু পরিস্ফুট করিয়া আমাদের অন্তরে প্রকাশমান হও, তোমাকে দেখিয়া আমাদের নয়ন মন সার্থক হউক্! তুমি একবার আসিয়া আমাদের অভ্যন্তরে অধিষ্ঠান কর, তাহা হইলে আমরা বিশ্ববিজয়ী সত্যের বলে বলীয়ান হইব; তুমি তোমার এক বিন্দু রশ্মি আমাদের মধ্যে প্রেরণ কর, তাহা হইলে জ্ঞানের আলোকে আমাদের সকল সংশয় তিরোহিত হইয়া যাইবে; ও তোমার অনন্ত অপার গম্ভীর জ্ঞান-প্রেমের দ্বার আমাদের হৃদয়ে উদ্ঘাটন কর, তাহা হইলে আমরা তাহার আকর্ষণে আকৃষ্ট হইয়া সংসারের সমস্ত মোহবন্ধন তুচ্ছ করিতে পারিব; তোমার সত্যং জ্ঞানমনন্তং মূর্ত্তি আমাদের নিকট প্রকাশিত কর এই আমাদের প্রার্থনা।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।

দশম উপদেশ।

৫৫ ব্রাহ্ম সম্বৎ ৩ চৈত্র রবিবার।

পরব্রহ্মের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা প্রেমের দিক্ দিয়া অতি সহজ, জ্ঞানের দিক্ দিয়া অতি কঠিন।

শ্রদ্ধা কি না ঐকান্তিক বিশ্বাস। * জ্ঞানালোকে সত্য প্রকাশ পায়, প্রকাশ পাইলেও সত্যের প্রতি

---

* সজ্জন-তোষিণী নামক একখানি বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের পত্রিকায় এই কথাটির বিরুদ্ধে উক্ত হইয়াছে যে, "প্রেমের দিক্ দিয়া শ্রদ্ধা ও জ্ঞানের দিক্ দিয়া শ্রদ্ধার কি ভেদ ও কি বিলক্ষণ তাহা আমরা বুঝিতে পারি না।" সম্পাদক মহাশয় যে, কেন বুঝিতে পারেন না, তাহা আমরা বুঝিতে পারিলাম না। যাহার প্রেমচক্ষু ফুটে নাই জ্ঞানের উপদেশ দ্বারা সৌন্দর্য্যের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা জন্মাইয়া দেওয়া কত কঠিন সম্পাদক মহাশয় কি তাহা জানেন না? চন্দ্র উদিত হইতে দেখিয়া বিদূষক যখন মোদকের সহিত তাহার উপমা দিল, তখনই বুঝা গেল যে, সৌন্দর্য্যের প্রতি তাহার শ্রদ্ধা নাই। সে ব্যক্তি প্রেমের দিক্ দিয়া চন্দ্রকে দেখিতে জানে না; এখন, কে এমন নির্ব্বোধ যে সে ব্রাহ্মণকে চন্দ্রের সৌন্দর্য্য অনুভব করাইবার জন্য বিজ্ঞান-শাস্ত্রের নানাবিধ প্রমাণ দর্শাইবে? জ্ঞানের দিক্ দিয়া সৌন্দর্য্যের প্রতি শ্রদ্ধা উৎপাদন করা যদি সহজ হইত তবে অলঙ্কার শাস্ত্র পড়িলেই বিদ্বান্ ব্যক্তি মাত্রই কবি হইতে পারিতেন। সৌন্দর্য্য যে কি তাহা ভাবেই বুঝিতে হয়, জ্ঞানে তাহা বুঝিতে পারা সুকঠিন। কিন্তু যাহা জ্ঞানে বুঝা হয় তাহাই প্রকৃতরূপে বুঝা হয়, ভাবে কেবল আভাস মাত্র বুঝা হইয়া থাকে; এজন্য যে কোন বিষয়ের তত্ত্ব শুদ্ধ কেবল আমরা ভাবে বুঝিয়াই ক্ষান্ত থাকি, তাহার সহিত অনেক সময়ে ভুল জড়ানো থাকে; বিবেক দ্বারা সেই ভুল গুলিকে অপসারণ করিয়া প্রকৃত তত্ত্ব নির্ণয় করা জ্ঞানের কার্য্য; এইরূপ জ্ঞানের দিক্ দিয়া যখন কোন বিষয়ে আমাদের শ্রদ্ধা হয়, তখন সে শ্রদ্ধা অর্জ্জন করিতে আমাদের যেমন পরিশ্রম লাগিয়াছে তাহার মূল-ও তেমনি দৃঢ় হইয়াছে। প্রেম-দ্বারা আমরা কতবার কত বিষয় ভাবে বুঝিয়া লই; তাহা, যখন করি তখন সেই সেই বিষয় সহজেই আমাদের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করে। একজন প্রসিদ্ধ ইংরাজী কবি কোনস্থলে বলিয়াছেন "বাসনাই ভাবনার জনক;" প্রেমের দিক্ দিয়া শ্রদ্ধার সম্বন্ধে তেমনি বলা যাইতে পারে যে, বাসনাই সে শ্রদ্ধার জনক; যাহাতে যাহার প্রেম তাহা স্থায়ী হউক এই তাহার আন্তরিক বাসনা,

সকলের সমান মাত্রায় শ্রদ্ধা হয় না। সত্য আমাদের নিকট প্রকাশ পাইলেও অনেক সময়ে আমরা

আমরা যাহাকে ইচ্ছা করি যে,—সে চিরজীবী হউক, তাহাব আমরা পাঠ লিখি "চিরঞ্জীবেষু",—সে সত্য-সত্যই চিবজীবী এই বাক্যে আমরা শ্রদ্ধা সমর্পণ করি; এইরূপ প্রেমের দিক্ দিয়া শ্রদ্ধা সমর্পণ সর্ব্বদাই আমরা করিয়া থাকি—এবং তাহাতে ভুলের সম্ভাবনা প্রযুক্ত জ্ঞান-দ্বারা সেই শ্রদ্ধা দৃঢ় করিবার জন্য সচেষ্ট হই। শ্রদ্ধা যতক্ষণ শুদ্ধ কেবল প্রেমকে আশ্রয় করিয়া বর্ত্তিয়া থাকে ততক্ষণ তাহা কাঁচা থাকে, যখন তাহা জ্ঞানের অবলম্বন পায় তখনই তাহা পাকা হয়। পত্নী পতিকে সর্ব্বাপেক্ষা ভালবাসে বলিয়া তাহাকে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল বলিয়া বিশ্বাস করে,—এরূপ বিশ্বাস সহজ বটে কিন্তু ওরূপ বিশ্বাসকে বিশ্বাস করা যাইতে পারে না; পত্নী যদি অনুসন্ধান ও পরীক্ষার দ্বারা পতির সদ্‌গুণসমস্ত বিশেষ রূপে অবগত হইয়া তাঁহার ঐ হৃদয়ের বিশ্বাসকে দৃঢ় করেন, তাহা হইলেই বলা যাইতে পারে যে ঐ পতির প্রতি ঐ পত্নীর শ্রদ্ধা জ্ঞানের দিক্ দিয়া উৎপন্ন হইয়াছে। স্ত্রীলোকের অতর্কিত সরল বিশ্বাস সচরাচর প্রেমের দিক্ দিয়া হইয়া থাকে, ও পুরুষের কঠোর অনুসন্ধানশালী বিশ্বাস সচরাচর জ্ঞানের দিক্ দিয়া হইয়া থাকে, প্রেমী ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাঁহারা রাগান্ধতার কুহকে বিশ্বাস করিয়া ঠকেন—তাঁহাদের সংখ্যা অধিক, না জ্ঞানী ব্যক্তিদিগের মধ্যে যাঁহারা অতি-বুদ্ধির যুক্তিতে বিশ্বাস করিয়া ঠকেন—তাঁহাদের সংখ্যা আধক, ইহা বলা কঠিন; কিন্তু এটি বেস্ বলা যাইতে পারে যে, যাঁহাদের মনে অনুরাগ এবং বুদ্ধি উভয়ের যথোচিত সামঞ্জস্য আছে, তাঁহারাই সকল অপেক্ষা কম ঠকেন। প্রেমশূন্য বুদ্ধি বুদ্ধিই নহে, তাহা অতিবুদ্ধি! জ্ঞান-শূন্য প্রেম প্রেমই নহে, তাহা জড়-আসক্তি; জ্ঞান এবং প্রেমের সামঞ্জস্যই ধর্ম্মের দৃঢ় ভিত্তিমূল। যাঁহারা মনে করেন যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম এতদিন শুষ্ক জ্ঞানের ধর্ম্ম ছিল; এখন নূতন বৈষ্ণবদিগের উত্তেজনায় তাহা প্রেমের ধর্ম্ম হইতেছে, তাঁহারা শ্রীমৎ প্রধান আচার্য্য মহাশয়ের ব্যাখ্যান প্রভৃতি গ্রন্থের যে কোন একটি পত্র উলটাইবেন সেই পত্রেই তাঁহাদের ভুল

অশ্রদ্ধা করিয়া তাহাকে হারাইয়া ফেলি। মিথ্যার প্রতিই বরং আমরা অতর্কিত ভাবে শ্রদ্ধা সমর্পণ করি ;—একথা আমরা কর্ণে শ্রবণ করি মাত্র যে,

কোহ্যেবান্যাৎ কঃ প্রাণ্যাৎ যদেষ আকাশ আনন্দোন স্যাৎ।

ভাঙ্গিয়া যাইবে ; এরূপ সত্ত্বেও উক্ত সম্পাদক মহাশয় বলিয়াছেন যে, "আমরা দেখিতেছি যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম ক্রমশঃ জ্ঞানাপেক্ষা প্রেমের অধিক সম্মান করিতে প্রস্তুত হইতেছে। এইটি ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত উন্নতি বলিয়া বোধ হয়।" এ কথার আমরা কোন অর্থ বুঝিতে পারিলাম না। আদি ব্রাহ্মসমাজ কোন কালেই এঁরূপ কোন বাক্য বলেন নাই যাহাতে জ্ঞানকে প্রেম অপেক্ষা বড় বুঝায় বা প্রেমকে জ্ঞান অপেক্ষা বড় বুঝায় ; আদি ব্রাহ্মসমাজ হইতে কুতর্ক প্রভৃতির বিরুদ্ধে অনেক স্থলে অনেক কথা বলা হইয়াছে বটে কিন্তু কোন স্থলেই জ্ঞানের গুণ-লাঘব করা হয় নাই,—অন্ধ ভক্তির বিরোধে অনেক স্থলে অনেক কথা বলা হইয়াছে বটে কিন্তু কোন স্থলেই বিশুদ্ধ প্রেম ভক্তির গুণ-লাঘব করা হয় নাই। ধর্ম্মরূপ গৃহ প্রতিষ্ঠা করিতে হইলে—জ্ঞান এবং প্রেম দুইই চাই ; জ্ঞান যদি না থাকে তবে ঐ গৃহের পত্তন ভূমি কোথায় ? প্রেম যদি না থাকে তবে উহার প্রয়োজন কোথায় ? গৃহের পত্তন-ভূমি এবং প্রয়োজন দুইই যখন সমান আবশ্যক তখন জ্ঞান প্রেম দুয়ের একটিকে খাটো করিয়া আর একটিকে বাড়াইতে যাওয়া বিষম বিভ্রাট্। বর্ত্তমান উপদেশের অভিপ্রায় স্বতন্ত্র-প্রকার। তাহার অভিপ্রায় সংক্ষেপে এই যে, প্রেমকে জ্ঞান দ্বারা দৃঢ় করা উচিত ও জ্ঞানকে প্রেম দ্বারা সজীব করা উচিত। বর্ত্তমান বিবাদের সার মীমাংসা এই যে, আত্মার মূল-প্রদেশে—আত্মপ্রত্যয় সিদ্ধ বিশুদ্ধ জ্ঞান প্রেমময়, ও বিষয়াতীত অমায়িক প্রেম জ্ঞানময়—দুয়ের মধ্যে কিছুমাত্র ব্যবধান নাই ; এ বিষয়ে আমাদের সহিত সম্পাদক মহাশয়ের কোন মত-ভেদ নাই,—তাহা তিনি স্বমুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন।

কেবা শরীরচেষ্টা করিত কেবা জীবিত থাকিত যদি এই আকাশে আনন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্ম না থাকিতেন; কিন্তু এ কথাটির প্রতি আমাদের বিশ্বাস কতটুকু? অতীব যৎসামান্য! এত অল্প যে তাহার প্রাণে কোন বল নাই! কিন্তু যখন আমরা শুনি যে, "অদৃষ্টই সকলের মূল—অদৃষ্টেরই বলে আমরা জীবিত আছি—অদৃষ্টেরই বলে আমরা চলাবলা করিতেছি—অদৃষ্টই জগতের মূলাধার" তখন উহার ভাবার্থ আমরা কি যে বুঝিলাম তাহার ঠিকানা নাই, অথচ উহা শুনিবা মাত্র আমাদের মন কেমন সহজে বিশ্বাস করিয়া ফেলে যে, "এই কথাই ঠিক্"! আনন্দকে আমরা জ্ঞান দ্বারা উপলব্ধি করি—আনন্দ যে কি তাহা আমরা জানি,—ইহা আমরা প্রত্যক্ষবৎ জানি যে, আনন্দই আমাদের সকল কার্য্যের মূল প্রবর্ত্তক—আনন্দই আমাদের সকল কার্য্যের চরম লক্ষ্য; আনন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্মই সকলের মূলাধার—এ কথাটি জ্ঞানের কথা,—তথাপি ইহার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা হইল না; আর অদৃষ্টকে আমরা কখন জ্ঞান-দ্বারা উপলব্ধি করি না—আনন্দ যে কি তাহা আমরা জানি, অদৃষ্ট যে কি তাহা আমরা জানি না; আনন্দের আকর্ষণ আমরা বুঝিতে পারি এবং তাহা কিরূপে কার্য্যের প্রবর্ত্তনা করে তাহাও আমরা

হৃদয়ঙ্গম করি, অদৃষ্ট যে কি আকর্ষণে জগৎকে বশ করিয়াছে তাহা আমরা কিছুই বুঝি না—কস্মিন্ কালেও বুঝিতে পারিব না, আনন্দ যে মূল প্রবর্ত্তক পদের উপযুক্ত, ইহা আমাদের জানা কথা,—ইহা জ্ঞানের কথা, অদৃষ্ট যে, কোন কিছুর প্রবর্ত্তক, ইহা আমাদের না জানা কথা,—ইহা অজ্ঞানের কথা ;—জ্ঞানে যাহা স্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে তাহা আমরা কখন বা উপেক্ষা করিয়া কখন বা উপহাস করিয়া কখন বা তুচ্ছ তাচ্ছিল্য করিয়া অনায়াসে উড়াইয়া দিই, আর, জ্ঞানে যাহার মূল খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, তাহারই প্রতি আমরা ঐকান্তিক শ্রদ্ধা সমর্পণ করি,—ইহা কি আমাদের আত্মার বিকার-দশা নহে ? আমরা সত্যকে জানিয়াও সত্যকে ভালবাসি না—আমাদের জ্ঞানের সত্য আমাদের প্রাণের সত্য নহে—ইহাই আমাদের আত্মার বিকার-দশা ! আমরা মিথ্যাকে না জানিয়াও মিথ্যাকে ভালবাসি—জ্ঞানের মিথ্যাই আমাদের প্রাণের সত্য—ইহাই আমাদের আত্মার বিকার-দশা ! জ্ঞানের প্রশস্ত পথের উপর আমাদের মনের মালিন্য উপেক্ষা অশ্রদ্ধা অযত্ন রাশীকৃত করিয়া সে পথকে আমরা যত দুর্গম করিয়া তুলিয়াছি প্রকৃত পক্ষে তাহা তত দুর্গম নহে। শ্রদ্ধার অভাব-প্রযুক্ত জ্ঞান পন্থীর মন পদে পদে সংশয়

দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হয়। সে বাধা অতিক্রম করিতে অনেক সময় লাগে, কিন্তু একবার তাহা অতিক্রম করিয়া উঠিতে পারিলে সম্মুখের পথ চির কালের মত নিষ্কণ্টক হইয়া যায়।

প্রেমের পথ যদিও সহজ কিন্তু তাহাকে বিশ্বাস নাই,—সে পথ জলপথের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে মূর্ত্তি পরিবর্ত্তন করে,—অনুকূল বায়ু বহিল তো তাহা দিব্য সুগম, প্রতিকূল বায়ু বহিল তো তাহাতে অগ্রসর হওয়া সুকঠিন। কুসঙ্গের আবর্ত্তে ও কুতর্কের ঝঞ্ঝা-বাতে ঈশ্বরপ্রেমীর সরল অন্তঃকরণ মোহে নিমগ্ন হওয়া কিছুই অসম্ভব নহে। কিন্তু যে জ্ঞানী ব্যক্তি কুসঙ্গের ভিতরের ভাব বুঝিয়াছেন—বন্ধুতার অব-গুণ্ঠনের মধ্যে স্বার্থপরতার বিষদন্ত এবং পাপাসক্তির কলঙ্ক-লেখা অবলোকন করিয়াছেন,—যিনি কুতর্কের ভিতরের কথা বুঝিতে পারিয়াছেন,—বিদ্যা বুদ্ধির প্রাখর্য্যের আড়ালে অবিদ্যার তমো ঘনীভূত দেখি-য়াছেন, তাঁহার সে ভয় নাই;—তাঁহার একমাত্র ভয়ের কারণ এই যে পাছে সংসারের অসারতা-জ্ঞানই তাঁহার জ্ঞানের চরম সীমা হয়—ও প্রেম তাঁহার হৃদয় হইতে পলায়ন করে; পাছে তাঁহাকে এই বলিয়া আক্ষেপ করিতে হয় যে, অনেক কুতর্ক ও সংশয় খণ্ডন করিয়া যদি বা সত্যের কূলে উপ-

নীত হওয়া গেল—ঈশ্বর-প্রেমের অভাবে এখন দেখিতেছি যে, চারিদিকে কেবল জীবন-শূন্য মরুভূমি প্রসারিত রহিয়াছে,—আমার এতদিনের এত যে পরিশ্রম, সমস্তই পণ্ডশ্রম হইল! এই জন্য ব্রাহ্মমাত্রেরই দুইদিকে সাবধান হওয়া উচিত,—(১) যেন প্রেমে উন্মত্ত হইয়া জ্ঞানকে অন্তঃকরণ হইতে নির্ব্বাসিত না করেন, (২) যেন বিদ্যামদে উন্মত্ত হইয়া প্রেমকে হৃদয় হইতে নির্ব্বাসিত না করেন!

সংসার চালাইতে হইলে যেমন আয় ব্যয় উভয় কার্য্যেই নিপুণ হওয়া আবশ্যক, ধর্ম্ম সাধন করিতে হইলে সেইরূপ জ্ঞান উপার্জ্জন এবং প্রেমবিতরণ দুই কার্য্যের জন্যই প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক। জ্ঞানকে যদি মনের ভিতর চাবি বন্ধ করিয়া রাখা যায়, অথবা লোককে দেখাইবার জন্য সময়ে সময়ে তাহাকে প্রকাশ্যে বাহির করা যায়, তবে কৃপণের ধনের ন্যায় তাহার থাকা না থাকা সমান; কিন্তু জ্ঞানের আশ্বাস-বাক্যে শ্রদ্ধান্বিত হইয়া আমরা যদি ঈশ্বরেতে রীতিমত প্রেম সমর্পণ করিতে পারি—জীবনের চরম উদ্দেশ্য সাধন-কার্য্যে যদি জ্ঞানকে রীতিমত খাটাইতে পারি—তবেই আমাদের জ্ঞান সার্থক হয়।

সাংসারিক কার্য্যের যেমন তিনটি অঙ্গ আয় ব্যয়

এবং স্থিতি, আধ্যাত্মিক সাধনেরও সেইরূপ তিনটি অঙ্গ,—ব্রহ্মজ্ঞান উপার্জ্জন, ব্রহ্মে প্রীতি সমর্পণ, এবং ধর্ম্মে স্থিতি। যতক্ষণ আমরা ব্রহ্মজ্ঞানের উপার্জ্জনে নিযুক্ত থাকি—পরম সত্যের অনুসন্ধানে নিযুক্ত থাকি—ততক্ষণই জ্ঞান জাগ্রত অবস্থায় থাকে তাহার পরে তাহা মনোমধ্যে বিলীন হইয়া সংস্কার-মাত্রে পর্য্যবসিত হয়, তেমনি আবার যতক্ষণ আমরা ঈশ্বরেতে প্রেম সমর্পণ করি, ততক্ষণই আমাদের প্রেম জাগ্রত অবস্থায় থাকে তাহার পরে তাহা সংস্কার-অবস্থা প্রাপ্ত হয়। ঈশ্বরের প্রতি যদি আমাদের লক্ষ্য থাকে তবে যেখান হইতে যে কোন সত্য প্রাপ্ত হই তাহা ঈশ্বরের নিকট হইতেই প্রাপ্ত হই, আর, যেখানে যাহার প্রতি নিঃস্বার্থ প্রেম প্রদান করি তাহা ঈশ্বরকেই প্রদান করি। ঈশ্বরের নিকট হইতে জ্ঞান উপার্জ্জন এবং ঈশ্বরেতে নিঃস্বার্থ প্রীতি সমর্পণ এই দুই কার্য্যের সংস্কার যখন আমাদের আত্মাতে বদ্ধমূল হয়—তখন সেইরূপ সংস্কার প্রকৃষ্টরূপে ধর্ম্ম শব্দের বাচ্য। জলের ধর্ম্ম যেমন শৈত্য এবং অগ্নির ধর্ম্ম যেমন উত্তাপ, সেইরূপ, মোহমুক্ত আত্মার ধর্ম্মই—পরম সত্যজ্ঞান উপার্জ্জন এবং বিশুদ্ধ নিষ্কাম প্রেম বিতরণ। ব্রহ্মজ্ঞান এবং ব্রহ্মপ্রীতির সংস্কার যখন মনোমধ্যে বদ্ধমূল হয়, তখন মন

স্বভাবতই সত্যের দিকে ধাবিত হয় ও কার্য্য স্বভাবতই মঙ্গলের দিকে ধাবিত হয়—ইহারই নাম ধর্ম্ম। মনুষ্যত্বই মনুষ্যের ধর্ম্ম,—সত্যজ্ঞানের উপার্জ্জন এবং নিঃস্বার্থ প্রেমের বিতরণেই মনুষ্যত্ব—সুতরাং ইহাই ধর্ম্ম শব্দের বাচ্য।

ব্রাহ্ম-ধর্ম্মে উক্ত হইয়াছে

"ব্রহ্মনিষ্ঠো গৃহস্থঃ স্যাৎ তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণঃ
যদ্‌যৎ কর্ম্ম প্রকুর্ব্বীত তদ্‌ব্রহ্মণি সমর্পয়েৎ।"

গৃহস্থ ব্যক্তি ব্রহ্মনিষ্ঠ এবং তত্ত্বজ্ঞানপরায়ণ হইবেন, ইহাতে ব্রহ্মজ্ঞান উপার্জ্জনের কর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হইতেছে এবং তিনি যে যে কর্ম্ম করিবেন তাহা পরব্রহ্মেতে সমর্পণ করিবেন, ইহাতে ঈশ্বরেতে প্রীতি সমর্পণের কর্ত্তব্যতা উপদিষ্ট হইতেছে। ঈশ্বরোদ্দেশে নিঃস্বার্থ ভাবে জগতে প্রেম বিতরণ করিলে তাহা ঈশ্বরেতেই সমর্পণ করা হয়। প্রীতির উত্তেজনায় কেহ যদি কোন ব্যক্তিকে একটি মূল্যবান্ অঙ্গুরীয়ক প্রদান করেন, তবে তাঁহার সে দানকে অঙ্গুরীয়ক-দান না বলিয়া প্রেমদান বলাই সঙ্গত—কেন না অঙ্গুরীয়ক কেবল একটা উপলক্ষ মাত্র, তিনি যদি গর্ব্বের উত্তেজনায় ঐ অঙ্গুরীয়কটি প্রদান করিতেন তাহা হইলে তাঁহার সে দান দানই হইত না—তাহা অঙ্গুরীয়কের বিনিময়ে দাতৃত্বগৌরব ক্রয় করা মাত্র,

এই জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম বলেন "শ্রদ্ধয়া দেয়ং" শ্রদ্ধার সহিত দান করিবে। দান মাত্রই প্রেমদান, তদ্ভিন্ন আর যে কোন দান তাহা দানই নহে—তাহা ক্রয় বিক্রয় মাত্র। আমরা ঈশ্বরকে প্রেম ভিন্ন আর কিছুই দিতে পারি না, ঈশ্বর আমাদের প্রেম ভিন্ন আর কিছুই গ্রহণ করেন না,—আত্মার সহিত পরমাত্মা প্রেমসূত্রেই গ্রথিত।

সংসারের সুখদুঃখে; ভয় লোভে, সম্পদ বিপদে, ঈশ্বর-প্রীতি যখন বিচলিত হয়, তখন তাহাকে স্বপদে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য জ্ঞানের সহায়তা আবশ্যক হয়। জ্ঞানের নিকট হইতে আমরা বিবেক প্রাপ্ত হইতে পারি। অস্থায়ী সুখদুঃখের সহিত নিত্য ব্রহ্মানন্দের কি প্রভেদ, ভয়-লোভের সহিত নিঃস্বার্থ প্রেমের কি প্রভেদ, সম্পদ বিপদের সহিত অক্ষয় চির-সম্পদের কি প্রভেদ, জ্ঞানই তাহা আমাদিগকে দেখাইয়া দিতে পারে। জ্ঞানের উপদেশ গ্রহণ পূর্ব্বক আমরা যদি সুখদুঃখের চঞ্চল তরঙ্গ কাটাইয়া আত্মার অন্তরতম অটল ব্রহ্মানন্দে নিমগ্ন হইবার চেষ্টা করি, ভয়-লোভের স্রোত অতিক্রম করিয়া নিঃস্বার্থ প্রেমের আকর্ষণে মনকে ভাসাইয়া দিবার চেষ্টা করি, সম্পদ বিপদের আবরণ ভেদ করিয়া পরব্রহ্মের অভয়-পদ আশ্রয় করিতে চেষ্টা

করি, তাহা হইলে আমরা আনন্দময় অনন্ত জীবনের পথে অবশ্যই অগ্রসর হই। জ্ঞানের প্রসাদে যখন মনের স্থৈর্য্য হয়, তখনই ঈশ্বর-প্রীতি নিরুদ্বেগে স্বীয় অভীষ্ট পথে ধাবিত হয় নচেৎ তাহা সম্ভবে না। সত্যজ্ঞান এবং নিঃস্বার্থ প্রেম এই দুয়ের সঙ্গম-স্থানই ধর্ম্মের প্রস্রবণ।

আইস আমরা ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি "দেহ জ্ঞান—দিব্য জ্ঞান, দেহ প্রতি—শুদ্ধ প্রীতি, তুমিই মঙ্গল-আলয়। ধৈর্য্য দেহ বীর্য্য দেহ, তিতিক্ষা সন্তোষ দেহ বিবেক বৈরাগ্য দেহ দেহ ও-পদ আশ্রয়।" ঈশ্বর স্বয়ং যে জ্ঞান মনুষ্যে মনুষ্যে বিতরণ করিতেছেন, তাহাই দিব্য জ্ঞান; তিনি যে প্রীতির প্রস্রবণ মনুষ্য-হৃদয়ে উন্মুক্ত করেন, তাহাই বিশুদ্ধ প্রীতি; এবং তিনি যে ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক তাহাই সনাতন সার ধর্ম্ম,—তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্ম রূপে আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছে। তিনি আমাদের প্রতি কৃপা করিয়া দুঃখ-শোকময় সংসারের মধ্যে আনন্দের দ্বার উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন—শুষ্ক মরুভূমিতে প্রেমের উৎস উৎসারিত করিয়া দিয়াছেন—ভয়-বিপদের অন্ধকারে অমৃত অভয় জ্যোতি বিকীর্ণ করিয়া দিয়াছেন—তাহাই ব্রাহ্মধর্ম্মরূপে আমাদের মধ্যে আবির্ভূত হইয়াছে।' আইস আমাদের প্রাণদাতা

এবং জ্ঞানদাতা পরম পিতাকে শ্রদ্ধা ভক্তির সহিত প্রণাম করিয়া তাঁহার সেই ব্রাহ্মধর্ম্ম—তাঁহার সেই অমৃত আশীর্ব্বাদ—মস্তকে ধারণ করি, সেই জ্ঞানাঞ্জনে মনশ্চক্ষু অঙ্কিত করি, সেই শোকতাপহারী সঞ্জীবনী সুধা হৃদয়ে লেপন করি,—তাহা হইলেই আমাদের মনুষ্য জন্ম সার্থক হইবে।

ওঁ একমেবাদ্বিতীয়ং।